বসন্ত বিলাপ

হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM

প্রথম আলোয় প্রকাশিত রাজনীতি ও সমাজ, আত্মস্মৃতি, ক্রিকেট, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, ঈদের নাটক, নিজের চলচ্চিত্র, মৃত্যুচিন্তা—এসব বিষয়ে ২৫টি রচনা, দুটি গল্প এবং আটটি সাক্ষাৎকার নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের একটি অনন্য গ্রন্থ এটি। কিছু লেখায় সমকালীন বিষয়ে লেখকের মতামত সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে, কোনো কোনো রচনায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন। কিছু রচনায় রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি। তাঁর অনন্য রসবোধ ও অনুপম রচনাশৈলী প্রতিটি রচনাকে উপভোগ্য করে তুলেছে। সাক্ষাৎকারগুলো পড়লে মনে হবে বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গিসহ একজন সম্পূর্ণ হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রথম আলো প্রকাশের একেবারে শুরু থেকেই এই পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে বিচিত্র বিষয়ে লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ। গল্প-উপন্যাস তো বটেই, এর বাইরেও তাঁর বেশ কিছু রচনা *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়েছে। সেরকম বেশ কিছু ছোট আয়তনের গদ্য রচনা এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হলো। কিছু লেখায় সমকালীন বিষয়ে লেখকের মতামত সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে, কোনো কোনো রচনায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন। কিছু রচনায় রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি ও একান্ত অনুভূতির কথা। রয়েছে দুটি চমৎকার গল্প। তাঁর অনন্য রসবোধ ও অনুপম রচনাশৈলী প্রতিটি রচনাকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

প্রথম আলোয় প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের আটটি সাক্ষাৎকারও রয়েছে এ সংকলনে। এসব সাক্ষাৎকারে নিজের জীবন, বিশ্বাস, লেখালেখি, নাটক ও চলচ্চিত্র নিয়ে তিনি কথা বলেছেন; সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের বাইরেও অনেক বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। সেসব বিষয়েও তাঁর বলার ভঙ্গি আশ্চর্যরকম প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী। তাঁর সাক্ষাৎকারগুলো পড়লে মনে হবে বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গিসহ একজন সম্পূর্ণ হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সামনে উপস্থিত।

হুমায়ূন আহমেদ

জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮, নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জে, নানাবাড়িতে। বাবা পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র হুমায়ূন আহমেদ শিক্ষাজীবন শেষে একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি সম্পন্ন করেন।

ছাত্রজীবনেই তাঁর লেখালেখির শুরু। প্রথম প্রকাশিত বই *নন্দিত নরকে* (১৯৭৩)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *শঙ্খনীল কারাগার, জোছনা ও জননীর গল্প, লীলাবতী, মধ্যাহ্ন, বাদশাহ নামদার* প্রভৃতি। বাংলা ভাষার অত্যন্ত জনপ্রিয় এই কথাশিল্পী উপন্যাস ও গল্পের পাশাপাশি লিখেছেন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিও। অধ্যাপনা ছেড়ে একসময় তিনি পুরোপুরি লেখালেখি, নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। টেলিভিশন নাটকের পুরোনো ধারা বদলে দেন তিনি। টেলিভিশনে তাঁর জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক *এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়, কোথাও কেউ নেই*। তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্যামল ছায়া* ও *ঘেটুপুত্র কমলা*।

জীবৎকালেই তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখক শিবির পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ১৯ জুলাই ২০১২ নিউ ইয়র্কের এক হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

বসন্ত বিলাপ

নানা রচনা, গল্প ও সাক্ষাৎকার

বসন্ত বিলাপ

প্রথম আলোয় প্রকাশিত নানা রচনা

গল্প ও সাক্ষাৎকার

হুমায়ূন আহমেদ

প্রথমা প্রকাশন

ভূমিকা

হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন গল্প বলার জাদুকর। তাঁর বিচিত্র গল্প-উপন্যাসের ভুবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা বুঝতে মোটেই দেরি হয় না। এই জাদু দিয়ে তিনি বাংলাভাষী এক বিশাল পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যারা তাঁর বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। হুমায়ূন আহমেদের বই প্রকাশের পর নিমেষে তাই বিক্রি হয়ে যেত হাজার হাজার কপি। তাঁর রসবোধ ছিল সেরা লেখকদের মতো উঁচুমানের। আর ছিল নিজস্ব মতামত। নিজের মতামত তিনি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন।

বিজ্ঞান ছিল হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। বিজ্ঞান-কল্পগল্পের প্রতিও ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ। গল্প-উপন্যাসসহ নানা ধরনের রচনা ও সাক্ষাৎকারে বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন। বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ করে লিখতে পারতেন তিনি।

প্রথম আলো প্রকাশের একেবারে শুরু থেকেই হুমায়ূন আহমেদ এতে নিয়মিত লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ; নানা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রসঙ্গে তাঁর মতামত দিয়েছেন। ২০০২ সালে *প্রথম আলো* প্রথমবারের মতো ঈদ ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। তাতে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস *হরতন ইশকাপন* প্রকাশিত হয়। গত দশ বছরে ঈদ ম্যাগাজিনে তাঁর পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও *প্রথম আলোর* বিভিন্ন বিভাগে তিনি বিচিত্র বিষয়ে লিখেছেন; তাঁর বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারও ছাপা হয়েছে *প্রথম আলোয়*। এসব সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের জীবন, বিশ্বাস, লেখালেখি, নাটক ও চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেছেন, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের বাইরেও অনেক বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। সেসব বিষয়েও তাঁর বলার ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী। তাঁর সাক্ষাৎকার পড়লে মনে হবে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিসহ একজন সম্পূর্ণ হুমায়ূন আহমেদকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আগেই বলেছি, গল্প-উপন্যাসের বাইরে *প্রথম আলোয়* বেশ কিছু রচনা ছাপা হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের। এই ছোট আয়তনের রচনাগুলোর বেশ

কয়েকটা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে লেখা। যেমন 'যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ'। বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগমন্ত্রীর ব্যর্থতা নিয়ে যখন দেশের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমা হচ্ছে, দাবি উঠেছে তাঁর পদত্যাগের, তখন হুমায়ূন আহমেদ *প্রথম আলোয়* এ রম্যরচনাটি লেখেন। তাঁর এ ধরনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে লেখা রচনাগুলোও পাঠক উপভোগ করেছেন। কখনো কখনো ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা লিখেছেন তিনি। তাতেও তাঁর রচনার নিজস্ব স্বাদ্ ভঙ্গিটি বজায় থেকেছে।

হুমায়ূন আহমেদের এ ধরনের ছোট ছোট গদ্যরচনাগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এ জন্য যে, এ লেখাগুলোয় সমকালীন বিষয়ে লেখকের মতামত সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে। সৃজনশীল লেখালেখির পাশাপাশি সমসাময়িক কালের বিচিত্র বিষয়ে প্রিয় লেখকের ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমত পাঠকেরা জানতে চান। এসব স্বল্প আয়তনের রচনায় হুমায়ূন আহমেদের পাঠক তাঁদের প্রিয় লেখকের মতামতই শুধু জানতে পারবেন না; তাঁর অনন্য রসবোধ ও রচনাশৈলীর জন্যও পাঠক রচনাগুলো উপভোগ করবেন।

এই সংকলনে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের কোনো উপন্যাস রাখা হয়নি। গল্প রাখা হয়েছে দুটি, সাক্ষাৎকার ৮টি। এর মধ্যে আমি সম্পাদক থাকাকালে *ভোরের কাগজ*-এ প্রকাশিত দুটো সাক্ষাৎকারও রয়েছে।

এ বইয়ে প্রকাশিত কিছু রচনা ইতিমধ্যে হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অনেক রচনা ও সাক্ষাৎকারই এখনো গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। সংকলিত রচনাগুলো পাঠককে তাঁর ভাষা, রসবোধ, রচনাশৈলী, চিন্তা ও বক্তব্য তুলে ধরার সহজ ভঙ্গির জন্যই যে আকর্ষণ করবে শুধু তাই নয়, ব্যক্তি হুমায়ূনকেও অনেকটা বুঝে নেওয়া যাবে এ বই থেকে।

এ সংকলন প্রকাশের অনুমতি পেয়ে আমরা আনন্দিত। এ সংকলন প্রকাশে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ।

মতিউর রহমান
সম্পাদক, *প্রথম আলো*

হুমায়ূন আহমেদ : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮—১৯ জুলাই ২০১২

সূচিপত্র

নানা রচনা

রাজনীতি ও সমাজ

আমরা কোথায় চলেছি? ১৩
বাউল ভাস্কর্য : এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব? ১৪
পিলখানা হত্যাকাণ্ড : মানব এবং দানব ১৭
অধ্যাপক ইউনূস ১৯
মন্টুর ফাঁসি ২১
যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ ২২

স্মৃতি

একা এবং একা ২৭
হাবলঙ্গের বাজার ৩১
বসন্ত বিলাপ ৩২
আমার বাবার জুতা ৩৬

ক্রিকেট

আজি এ বসন্তে ৪০
বাংলা ধোলাই : তেত্রিশটা কামান নিয়ে বসে আছি ৪২
ডাংগুলি ৪৫
মাঠরঙ্গ ৪৮

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

হাসন রাজা : বাউলা কে বানাইল রে? ৫২
রবীন্দ্রনাথ : তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে—এক ৫৫

রবীন্দ্রনাথ : তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে—দুই ৫৮
জাহানারা ইমাম : তিনি ৬০
আহমদ ছফা : পড়বে না তাঁর পায়ের চিহ্ন ৬৪
হারুকি মোরাকামি : নিউ ইয়র্কের আকাশে ঝকঝকে রোদ ৬৮

ঈদের নাটক
আমার ঈদের নাটক ৭২
ঈদ ভয়ংকর! ৭৩

নিজের চলচ্চিত্র
প্রসঙ্গ প্রিয়তমেষু ৭৬
'শিখতে শিখতে এগোলাম' ৭৭

মৃত্যুচিন্তা
মাইন্ড গেম ৮০

ছোটগল্প
শবযাত্রা ৮৫
রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলি, মস্তক ৯৭

সাক্ষাৎকার
'প্রতিটি লেখক এক অর্থে ধর্মপ্রচারক' ১০৯
'নিজের লেখা সম্পর্কে আমার অহংকার অনেক বেশি' ১১৬
'আমি এক অর্থে নিয়তিবাদী' ১২৫
'অর্ধেক হিমু, অর্ধেক মিসির আলী' ১৩৫
'লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরি' ১৩৭
বাদশাহ নামদার হুমায়ূন ১৪০
'মৃত্যু নিয়ে প্রায়ই ভাবি' ১৪৭
কিছু অলৌকিক ঘটনার বয়ান ১৫৩

নানা রচনা

১

আমরা কোথায় চলেছি?

আমাদের অতি প্রিয় শান্তিময় ছোট্ট সবুজ দেশটা কোথায় যাচ্ছে? একদল মানুষ শরীরে বোমা বেঁধে কী প্রমাণ করতে চাচ্ছে? বেহেশতের জন্য অপেক্ষা? নিরীহ মানুষের রক্ত মেখে কি বেহেশতে যাওয়া যায়?

নবীজি (সা.)-এর একটি বাণী এ রকম—'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ পেতে পারে কে? সেই ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহর সৃষ্ট জীবন সবচেয়ে বেশি উপকার পায়।' যারা পরম করুণাময়ের সৃষ্ট জীবন নষ্ট করছে, তারা কোন যুক্তিতে পরকালে তাঁর করুণা আশা করে?

একদল মানুষ ভুল চিন্তায় ভুল পথে হাঁটতে শুরু করেছে। তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। নবীজি (সা.) বলে গেছেন, 'মূল জিহাদ হলো নফসের বিরুদ্ধে।' অর্থাৎ নিজের হৃদয়ের ত্রুটির বিরুদ্ধে। যারা জিহাদের নামে শরীরে বোমা বাঁধছে, তারা কি নিজের সঙ্গে জিহাদ শেষ করে এসেছে?

আমাদের হতদরিদ্র এই দেশে একজন উপার্জনক্ষম মানুষ একা মারা যান না। তাঁর ওপর নির্ভরশীল সবারই মৃত্যু ঘটে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কাঁদেন। সেই কান্নায় স্বজনহারা বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয় একটি সকরুণ হাহাকার—আমার এখন কী হবে! আমি কোথায় যাব! কীভাবে বাঁচব!

দেশের আজ চরম দুঃসময়। এই দুঃসময়েও দেখছি, রাজনৈতিক প্রধান দুটি দল একে অন্যকে দুষছে। হায় রে রাজনীতি! রাজনীতিবিদদের কি এখনো মনে হচ্ছে না, আর দেরি করা যাবে না? সবাইকে একসঙ্গে বসতে হবে! দেশের বর্তমান ভয়াবহ সমস্যার সমাধান করতে হবে!

মহান রাজনীতিবিদেরা শুনুন! অপনাদের ক্ষমতা আপনাদের কাছেই

থাকবে। এক দল ক্ষমতায় বসবে, অপর দল বের হয়ে আসবে—এই চলবে। আমরা সাধারণ মানুষ আপনাদের ক্ষমতার বলয়ের ধারেকাছে যাব না। যেতে চাইও না। আমরা বোমাবাজি নামক রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি চাই। আপনারা আমাদের প্রতি দয়া করুন।

০১ ডিসেম্বর ২০০৫

বাউল ভাস্কর্য

এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব?

AMARBOI.COM

মাদ্রাসার কিছু ছাত্র হইচই করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরকার নতজানু। সরকার জনতার চেতনারই ছায়া, কাজেই আমরাও নতজানু। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। হুংকার শুনছি—'সব ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হবে। শিখা অনির্বাণ নিভিয়ে দেওয়া হবে।'

সরকার দেরি করছে কেন? শিখা অনির্বাণ নিভিয়ে অন্ধকারে প্রবেশ করলেই হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগের দরজা-জানালা এখনই সিল করে দেওয়া দরকার।

মাদ্রাসার যেসব বালক না বুঝেই হইচই করছে, তাদের কিছু ঘটনা বলতে চাচ্ছিলাম। তাদের না বলে আমি বর্তমান সরকারের সদস্যদের ঘটনাগুলো বলতে চাচ্ছি। তাঁরা কি শুনবেন?

আমাদের মহানবী (সা.) কাবা শরিফের ৩৬০টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার কথাও তিনি বললেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল কাবার মাঝখানের একটি স্তম্ভে। যেখানে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা। নবীজী (সা.) সেখানে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'এই ছবিটা তোমরা নষ্ট কোরো না।' কাজটি তিনি করলেন সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অসীম মমতা থেকে। মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পরেও ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগে কাবা

শরিফের মতো পবিত্র স্থানে এই ছবি ছিল, এতে কাবা শরিফের পবিত্রতা ও শালীনতা ক্ষুণ্ন হয়নি।

মহানবীর (সা.) প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাকের (আরব ইতিহাসবিদ, জন্ম : ৭০৪ খিষ্টাব্দ, মদিনা; মৃত্যু : ৭৬৭ খিষ্টাব্দ, বাগদাদ) লেখা *দি লাইফ অব মোহাম্মদ* গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বললাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটি অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম (প্রকাশকাল ২০০৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫২)।

আমরা সবাই জানি, হজরত আয়েশা (রা.) নয় বছর বয়সে নবীজীর (সা.) সহধর্মিণী হন। তিনি পুতুল নিয়ে খেলতেন। নবীজীর তাতে কোনো আপত্তি ছিল না, বরং তিনিও মজা পেতেন এবং কৌতূহল প্রদর্শন করতেন। (মুহাম্মদ আলী আল-সাবুনী, *রাওযাইউল বয়ন*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৩)

৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওমর (রা.) জেরুজালেম জয় করেন। প্রাণীর ছবিসহ একটি ধূপদানি তাঁর হাতে আসে। তিনি সেটি মসজিদ-ই-নববিতে ব্যবহারের জন্য আদেশ দেন। (আব্দুল বাছির, 'ইসলাম ও ভাস্কর্য শিল্প : বিরোধ ও সমন্বয়', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ পত্রিকা*, জুলাই ২০০৫ জুন ২০০৬)

পারস্যের কবি শেখ সাদিকে কি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু আছে? উনি হচ্ছেন সেই মানুষ, যার 'নাত' এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মিলাদে সব সময় পাঠ করে থাকেন।

বালাগাল উলা বি কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি...

মাদ্রাসার উত্তেজিত বালকেরা শুনলে হয়তো মন খারাপ করবে যে, শেখ সাদির মাজারের সামনেই তাঁর একটি মর্মর পাথরের ভাস্কর্য আছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা তা ভাঙেনি।

ইসলামের দুজন মহান সুফিসাধক, যাঁদের বাস ছিল পারস্যে (বর্তমান ইরান) এঁদের একজনের নাম জালালুদ্দিন রুমি। অন্যজন ফরিদউদ্দিন আত্তার (নিশাপুর)। তাঁর মাজারের সামনেও তাঁর আবক্ষমূর্তি আছে। (*বরফ ও বিপ্লবের দেশে*, ড. আবদুস সবুর খান, সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

কঠিন ইসলামিক দেশের একটির নাম লিবিয়া। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বিশাল একটা মসজিদ আছে। মসজিদের সামনেই গ্রিকদের তৈরি একটি মূর্তি স্বমহিমায় শোভা পাচ্ছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা মূর্তিটা

AMARBOI.COM

ভেঙে ফেলেনি।

আফগানিস্তানের তালেবানরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তি (যা ছিল বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ) ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা ভাঙছি সাঁইজির মূর্তি। যাঁর জীবনের সাধনাই ছিল—আল্লাহর অনুসন্ধান।

মাওলা বলে ডাক রসনা,
গেল দিন, ছাড় বিষয় বাসনা
যেদিন সাঁই হিসাব নিবে
আগুন পানি তুফান হবে
এই বিষয় তোর কোথায় রবে?
একবার ভেবে দেখ না।

—লালন শাহ

দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমার দম বন্ধ লাগছে। কীভাবে প্রতিবাদ করব তাও বুঝতে পারছি না। একজন লেখকের দৌড় তাঁর লেখা পর্যন্ত। বিটিভিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের গাথা *জোছনা ও জননীর গল্প* প্রচার হচ্ছে। প্রতিবাদ হিসেবে এই গাথার প্রচার আমি বন্ধ করলাম। দেশ মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্য এখনো তৈরি না।

বাংলাদেশে তো অনেক বড় বড় ইসলামি পণ্ডিত আছেন। তাঁরা কেন চুপ করে আছেন? তাঁরা কেন পূজার মূর্তি এবং ভাস্কর্যের ব্যাপারটা বুঝিয়ে সবাইকে বলছেন না?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মতো বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অতি তুচ্ছ এই প্রাণী নিজের মেধায় সৃষ্টিরহস্যের সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। তার পরিচয় সে রেখে যাচ্ছে কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায়। মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার এই প্রাণী তার দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মানুষের সৃষ্টির প্রতি সম্মান দেখানো মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতিই সম্মান দেখানো। কারণ সব সৃষ্টির মূলে তিনি বাস করেন।

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার।
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে

AMARBOI.COM

এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য মর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকে-মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৭ অক্টোবর ২০০৮

৩

পিলখানা হত্যাকাণ্ড
মানব এবং দানব

AMARBOI.COM

বাঘের গর্ভে সব সময় বাঘ জন্মায়, সাপ জন্ম দেয় সাপের। মানুষ একমাত্র প্রাণী যে মানুষের জন্ম দেয়, আবার দানবের জন্মও দেয়। দানবদের কর্মকাণ্ড দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করে আছি, কারণ এই দানবেরা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর অংশ, এরা ভিনগ্রহ থেকে আসেনি।

পিলখানার খুব কাছাকাছি আমি থাকি। বুধবার সকাল থেকেই গুলির শব্দ শুনছিলাম। গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার কিছু ছিল না। বিডিআর সপ্তাহ চলছে, তাদের কর্মকাণ্ড থাকতে পারে। অথচ তখন একে একে প্রাণ দিচ্ছিলেন নিরস্ত্র একদল অসহায় মানুষ। অস্ত্রধারী দানবদের ঠেকানোর কোনো উপায় তাঁদের ছিল না। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের চিন্তা-চেতনায় ছিল তাঁদের শিশুসন্তান এবং পরিবার। 'আমরা চলে যাচ্ছি, দানবদের থাবা থেকে তারা রক্ষা পাবে তো?'

পরম করুণাময়ের অসীম করুণায় জিম্মিদের প্রায় সবাইকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি।

এই উদ্ধার-প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব জাতি মনে রাখবে কি না আমি জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমৃত্যু মনে রাখব। তিনি যখন বজ্রকঠিন গলায় বললেন, 'কঠোর ব্যবস্থা নিতে আমাকে বাধ্য করবেন না।' তখনই তাঁর কাঠিন্য দানবদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল।

টক শোর জমানায় চ্যানেলে নানান টক শো চলছে। এদের কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি—অনেক আগেই মিলিটারি অ্যাকশনে যাওয়া উচিত ছিল। মিলিটারি দেখামাত্র 'বিডিআর ছোকরারা' অস্ত্র ফেলে দৌড় দেবে।

যদি বিদ্রোহীরা তা না করত তখন কী হতো? যে অস্ত্রধারী জানে, তার সামনে নিশ্চিত মৃত্যু, সে কী পরিমাণ ভয়ংকর হতে পারে—এই বিষয়ে কি টক শোর জেনারেল সাহেব জানেন? কতগুলো নারী এবং শিশু তখন তাদের হাতে জিম্মি। যেকোনো মূল্যে এদের আমাদের রক্ষা করতে হবে। এবং তাই করা হয়েছে।

নানান দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে আমরা এগোচ্ছি বলে আমাদের হৃদয়ে কাঠিন্য চলে এসেছে। সহজে আমাদের চোখে অশ্রুসজল হয় না। বিডিআরের এই ঘটনা পুরো জাতিকে কাঁদিয়েছে। দানবেরা কি এই অশ্রুর মূল্য জানে?

সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি যখন বিডিআর গেট দিয়ে প্রথম ঢুকছে, তখন সাঁজোয়া গাড়ির চালক কাঁদছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও কাঁদছিলাম।

পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ সাহেবকে দেখেও আমার চোখ ভিজে উঠল। তিনি তাঁর মেয়েজামাইকে হারিয়েছেন। হৃদয়ে কপাট লাগিয়ে পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে শান্তমুখে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আহা রে!

স্বজনহারারা যে-রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন তার নাম বীর উত্তম এম এ রব সড়ক। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন বীর উত্তম। দানবেরা তাদের ঐতিহ্য ভুলে গেছে? বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ এবং বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ তো তাদেরই পূর্বসূরি। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

স্বামীহারা কিছু মহিলার হতাশ ছবি টিভিতে দেখলাম। তাঁরা বলছেন, 'এখন আমাদের সন্তানদের কীভাবে মানুষ করব?' ঠিক তাঁদের মতোই একদিন আমার মা-ও কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'আমি আমার ছয়টা ছেলেমেয়েকে কীভাবে মানুষ করব?' তখন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। পরম করুণাময় আমার মা এবং তাঁর সন্তানদের ওপর করুণাধারা বর্ষণ করেছেন।

AMARBOI.COM

যেসব স্বামীহারা মা আজ সন্তানদের চিন্তায় অস্থির হচ্ছেন তাঁদের বলছি, আপনাদের পেছনে পুরো জাতি আছে। পরম করুণাময়ের করুণাধারার বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে।

আমার খুব ইচ্ছা করছে পিতাহারা সন্তানদের পাশে বসে কিছুক্ষণ গল্প করি। তাদের পিঠে হাত রেখে বলি—এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে। এই দিনেরে নিবে তোমরা সেই দিনের কাছে।

০২ মার্চ ২০০৯

৪

অধ্যাপক ইউনূস

AMARBOI.COM

একটি দৈনিক পত্রিকা অধ্যাপক ইউনূসকে নিয়ে প্রথম পাতায় কার্টুন ছেপেছে। সেখানে তিনি হাসিমুখে রোগাভোগা একজন মানুষের পা চেপে শূন্যে ঝুলিয়েছেন। মানুষটার মুখ থেকে ডলার পড়ছে। অধ্যাপক ইউনূস বড় একটা পাত্রে ডলার সংগ্রহ করছেন। কার্টুন দেখে কেউ কেউ হয়তো আনন্দ পেয়েছেন। আমি হয়েছি ব্যথিত ও বিস্মিত। পৃথিবী-মান্য একজন মানুষকে এভাবে অপমান করা যায় না। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনি, 'মানীকে মান্য করিবে।'

বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তিও আছে—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তদ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

অধ্যাপক ইউনূসকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখাও হয়নি। এর প্রধান কারণ, অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছ থেকে আমি নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পছন্দ করি। অনেক বছর আগে যখন অধ্যাপক ইউনূস নক্ষত্র হয়ে ওঠেননি, আমি তাঁর কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে একটা বই উৎসর্গ করেছিলাম। সেই বইও আমি নিজের হাতে তাঁকে দিইনি। যত দূর মনে পড়ে, ইউনূস সাহেবের ছোট ভাই সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের হাত দিয়ে

পাঠিয়েছি। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ কেউ না বলে তাঁর সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ সখ্য আছে।

অধ্যাপক ইউনূস যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন আমি নাটকের একটা ছোট্ট দল নিয়ে কাঠমান্ডুর হোটেল এভারেস্টে থাকি। হোটেলের লবিতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ আমার ইউনিটের একজন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। সে বলছে, 'স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি।'

সে বলেনি, অধ্যাপক ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সে বলেছে, আমরা পেয়েছি। অধ্যাপক ইউনূসের এই অর্জন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্জন।

আমার মনে আছে, এই আনন্দ-সংবাদ শোনার পর আমি শুটিং বাতিল করে উৎসবের আয়োজন করি। সেই উৎসবের শিখা আমি বুকের ভেতর এখনো জ্বালিয়ে রেখেছি।

দেশের বাইরে যখন সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে যাই, তখন আগের মতো হীনম্মন্যতায় ভুগি না। কারণ, এই সবুজ পাসপোর্ট অধ্যাপক ইউনূসও ব্যবহার করেন, আমাদের ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা ব্যবহার করেন।

আমার ছোট ছেলে নিষাদ 'সাহস' বলতে পারে না। 'হ' উচ্চারণে তার সমস্যা হয়। সে বলে 'সাগস'। আমিও তার মতো করে বলছি, অধ্যাপক ইউনূসকে ছোট করছে, কার এত বড় সাগস।

মানী লোকদের অসম্মান করে আমরা কী আনন্দ পাই? ব্যাপারটার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমরা যাঁরা সাধারণ, তাঁরা বলতে পারি, এই দেখো, তুমি আমাদের মতোই সাধারণ।

একটি পত্রিকায় পড়লাম, গান্ধীজিকে নিয়ে বই লেখা হয়েছে। সেই বইয়ে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, গান্ধীজি ছিলেন সমকামী। হায় রে কপাল!

অধ্যাপক ইউনূসকে গান্ধীজির মতো গভীর গর্তে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হলেও আমি বিস্মিত হব না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময়ই তাঁর পেছনে থাকব এবং আশা করব, তাঁর মাথার ওপরের ঘন কালো মেঘ সরে সূর্যকিরণ ঝলমল করে উঠবে। আশা করা ছাড়া একজন লেখক আর কীই-বা করতে পারেন!

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতালি*

২৮ এপ্রিল ২০১১

AMARBOI.COM

৫

মন্টুর ফাঁসি

আমার জীবনের প্রথম উপন্যাসটির নাম *নন্দিত নরকে*। সেই উপন্যাসের একটি চরিত্র মন্টু তার বোন রাবেয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে একটি খুন করে। জজ সাহেব তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অসহায় পরিবারটির কিছুই করার থাকে না। তারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমার আশায় বুক বাঁধে। রাষ্ট্রপতি ক্ষমাভিক্ষা দেন না। মন্টুর ফাঁসি হয়ে যায়।

উপন্যাসের রাষ্ট্রপতি নির্মম, কিন্তু বাস্তবের রাষ্ট্রপতিরা মমতা ও করুণায় আর্দ্র। তাঁরা ভয়াবহ খুনিকে ক্ষমা করে দেন। শুধু ফাঁসির হাত থেকে বাঁচা না, মুক্তি। এখন গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে ট্রাক মিছিল করে বাড়ি ফিরতেও বাধা নেই।

নিহত ব্যক্তির স্ত্রী রাষ্ট্রের কাছে দুটি প্রশ্ন করেছেন :

১. প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর পিতার হত্যার বিচার চাইতে পারেন, আমার পিতৃহারা সন্তানেরা কেন বিচার চাইতে পারবে না?

২. রাষ্ট্রপতির স্ত্রী আইভি রহমানের হত্যাকারীদের যদি ফাঁসির আদেশ হয়, তিনি কি তাদের ক্ষমা করবেন?

নিহতের বিধবা স্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মতোই স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর অবশ্যই রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করার অধিকার আছে।

আমিও এই দুই প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। প্রশ্নের উত্তর শোনার পরপরই *নন্দিত নরকে* উপন্যাসটি নতুন করে লিখব।

২৫ জুলাই ২০১১

AMARBOI.COM

৬

যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ

এখানে যে যোগাযোগমন্ত্রীর গল্প বলা হচ্ছে তিনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা এরশাদ আমলের মন্ত্রী নন। অন্য কোনো আমলের। তবে আনন্দের বিষয়, সব আমলের জিনিস একই।—লেখক

যোগাযোগমন্ত্রী সালাহউদ্দিন খান ভুলু সাহেবের দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর অভ্যাস। মন্ত্রীর কঠিন দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি এই অভ্যাস বহাল রেখেছেন। একটু উনিশ-বিশ অবশ্য হচ্ছে; আগে ঘুমানোর সময় একজন গায়ের ঘামাচি মেরে দিত, এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায়ই ভাবেন, পলিটিক্যাল পিএসকে ঘামাচি মারতে বলবেন। সে আগ্রহ নিয়ে কাজটা করবে। একটাই ভয়, কোনো পত্রিকায় যদি নিউজ চলে যায়! পত্রিকাগুলো চলে গেছে দুষ্টুদের দখলে। তারা সম্মানিত মন্ত্রীদের ওপর টেলিস্কোপ ফিট করে রেখেছে। আরাম করে ১০ মিনিট ঘুমানোর উপায়ও নেই।

সালাহউদ্দিন খান ভুলু দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন। মন-মেজাজ এখনো ধাতস্থ হয়নি। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন। এই সময় তাঁর পিএস (সরকারি) ঢুকলেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যারের ঘুম ভালো হয়েছে?

মন্ত্রী বললেন, আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি, দুপুরে আমি ঘুমাই না। চোখ বন্ধ করে একধরনের যোগব্যায়াম করি। 'শবাসন' এই ব্যায়ামের নাম। এতে টেনশন কমে।

পিএস বললেন, স্যার, সরি। আমি যোগব্যায়ামের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আপনার নাক ডাকার শব্দে বিভ্রান্ত হয়েছি।

আর বিভ্রান্ত হবেন না। নাক ডাকা না। দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা যোগব্যায়ামেরই অংশ। আমার নাকে পলিপ আছে বলে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাক ডাকার মতো শব্দ হয়। এখন ক্লিয়ার হয়েছে?

অবশ্যই, স্যার।

কোনো কাজে এসেছেন?

একটা রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মাইক্রোবাস ভেঙে গুঁড়া হয়ে গেছে। পাঁচজন মারা গেছে।

অ্যাকসিডেন্ট হলে মানুষ মারা যাবে, এটা নতুন কী? এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন?

অনেকেই আপনাকে দুষছে। রাস্তাঘাট ভাঙা, খানাখন্দে ভরা। এই কারণেই অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে।

এটা কী মাস?

ভাদ্র মাসের শুরু।

বৃষ্টি হচ্ছে না?

রোজ বৃষ্টি হচ্ছে।

এই বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ঠিক থাকে?

থাকে না, স্যার।

বাস্তবতা বুঝতে হবে। তুচ্ছ বিষয়ে মন্ত্রীকে দুষলে হবে না। বুঝেছেন?

জি স্যার।

খরা মৌসুম আসুক, রাস্তাঘাট ঠিক হবে।

সাংবাদিকেরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চায়।

শুনতে চাইলেই আমি শোনাব না। আপনি বলে দিন, গতবারের সরকারের যোগাযোগ খাতে সীমাহীন দুর্নীতির কারণে রাস্তাঘাটের আজ এমন বেহাল দশা। একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিন।

জি স্যার। স্টেটমেন্টের ব্যবস্থা করছি। তবে আপনাকে একটু কষ্ট করে হাসপাতালে যেতে হবে।

কেন?

মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় কিছু বিখ্যাত মানুষ মারা গেছেন। যাঁরা আহত, তাঁদের দেখতে যাওয়া উচিত।

বিখ্যাত মানুষ কে মারা গেল?

পিএস বিখ্যাত মানুষদের তালিকা বললেন।

মন্ত্রী বিরক্ত গলায় বললেন, এরা বিখ্যাত হলো কবে? আমি তো নামও শুনি নাই। মিডিয়া এদের বিখ্যাত বানিয়েছে। সব মিডিয়ার কারসাজি। দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে মিডিয়া।

যথার্থ বলেছেন। তবে মিডিয়াকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।

হাসপাতালে গিয়ে কী বলব, ঠিক করে এনেছেন? উল্টাপাল্টা কিছু বলে ফেলতে পারি। মুডি মানুষ তো, মুডের ওপর চলি।

পিএস বললেন, আমি দুই ধরনের বক্তব্য তৈরি করে এনেছি, যেটা আপনার পছন্দ। আপনি বলবেন, আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে, আমাদের

AMARBOI.COM

কী করার আছে?

মন্ত্রী বললেন, ভালো বক্তব্য। আল্লাহর ওপর কোনো কথা নেই। ধর্মভিত্তিক দল আমার এই বক্তব্য পছন্দ করবে।

অথবা আপনি বলবেন, মাইক্রোবাসের চালকের অদক্ষতাই দুর্ঘটনার কারণ। সে ওভারটেক করতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে দোষটা ওদের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে।

মন্ত্রী বললেন, এটাও খারাপ না। আমি বরং দুটো একত্র করে বলি। প্রথম বলি, মাইক্রোবাস চালকের ভুল। তারপর বলি, আল্লাহর মাল আল্লায় নিয়েছে। বুদ্ধিটা কেমন বের করেছি?

অসাধারণ। আপনার চিন্তাধারাই বৈপ্লবিক।

আমাদের এই মুডি মন্ত্রী নানা ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। মিডিয়া তাঁকে নিয়ে কিছু কাজকর্ম করল। মন্ত্রী যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখতে গেলেন, তখন বদগুলো তাঁর হাসিমুখের ছবি ছাপাল। রাস্তায় বিশাল এক গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন—এ রকম ছবি। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তাঁর পদত্যাগ চেয়ে প্রতিবেদন ক্ষমা করা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে? মন্ত্রীরা হলেন কচ্ছপ। কচ্ছপের মতো কামড় দিয়ে তাঁরা মন্ত্রিত্ব ধরে রাখবেন। এটাই নিয়ম।

মন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সচিবের পরামর্শে কিছু জটিল পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন। একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। একটা ছোট্ট সমস্যা তাতে হলো, দেখা গেল, সবাই দুর্নীতিবাজ। রসুনের বোঁটা অবস্থা। একজনকে শাস্তি দিলে বাকিরা খেপে যাবে। ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। কাজেই অনেক ঝামেলা করে একজন সৎ কর্মচারী খুঁজে তাঁকে বরখাস্ত করা হলো।

মন্ত্রী মহোদয় সব পত্রিকায় তাঁর একটি ছবি পাঠালেন। সেই ছবিতে তিনি কোদাল হাতে ভাঙা রাস্তার পাশে দাঁড়ানো। নিচে লেখা, 'মন্ত্রী মহোদয় নিজেই রাস্তা মেরামতে নেমে পড়েছেন'।

কোনো পত্রিকা এই ছবি ছাপাল না, উল্টো এক বদ পত্রিকা এই ছবি নিয়ে কার্টুন বানিয়ে ছাপিয়ে ফেলল। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, রাক্ষস টাইপ চেহারার এক লোক খালি গায়ে খাকি হাফপ্যান্ট পরে বেলচা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ের এবং পায়ের বড় বড় লোম দেখা যাচ্ছে। কার্টুনের নিচে লেখা, 'যোগাযোগমন্ত্রী বলেছেন, আমি একাই ৩৫০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত

AMARBOI.COM

করব, ইনশাআল্লাহ।'

মন্ত্রী তাঁর পিএসকে ডেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তিন কোটি টাকার একটা মানহানি মামলার ব্যবস্থা করুন। আমার ছবি বিকৃত করে ছেপে আমার মানহানি করেছে।

পিএস বললেন, বিকৃত করে তো ছাপে নাই, স্যার। কার্টুনে আপনাকে চেনা যায়।

আমাকে চেনা যায়?

জি স্যার।

আমার গা-ভর্তি লোম?

লোমের পয়েন্টে মামলা করতে পারেন। তবে এখন নতুন ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। এরপর এরা নিউজ করে দেবে—কার্টুন ছবিতে মন্ত্রীর গায়ের লোম দেখানোয় এক কোটি টাকার মানহানির মামলা।

এক সকালবেলার কথা। মন্ত্রীর স্ত্রী সালমা বানু (বিশিষ্ট সমাজসেবী, পরিবেশ রক্ষাকর্মী, বিপন্ন হনুমান বাঁচাও আন্দোলনের সভানেত্রী) তাঁর স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমাকে না জানিয়ে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি কী করে এই কাজ করলে?

মন্ত্রী বললেন, কী কাজ করলাম?

পদত্যাগ করেছ, আমাকে না জানিয়ে।

পদত্যাগ করব কোন দুঃখে?

পত্রিকায় নিউজ এসেছে। এই দেখো।

মন্ত্রী মহোদয় হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রী মহোদয় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।'

হতভম্ব মন্ত্রী তাঁর পিএসকে টেলিফোন করলেন। অনেকবার রিং হলো, পিএস ধরলেন না। তিনিও নিউজ পড়েছেন। এখন যে মন্ত্রী নন তাঁর টেলিফোন কেন ধরবেন! আমজনতার টেলিফোন ধরার কিছু নেই।

মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পিএসকে টেলিফোন করলেন। পিএস তাঁর কোনো কথা না শুনেই বললেন, পদত্যাগ করে ভালো করেছেন। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আচ্ছা রাখি।

মন্ত্রী লাইন কেটে দেওয়ার পর অনেকবার চেষ্টা করলেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব টেলিফোন ধরলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লক্ষ করলেন, পত্রিকার এই বানোয়াট খবর সবাই বিশ্বাস করে বসে আছে। তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর

AMARBOI.COM

সাব-ইন্সপেক্টর সিগারেট ফুঁকছিল, তাঁকে দেখে সিগারেট ফেলে না দিয়ে শুধু পেছনে আড়াল করল।

মন্ত্রী মহোদয় প্রধানমন্ত্রীকে ধরার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টা দেখতে পেলে রবার্ট ব্রুসও লজ্জা পেত। একসময় চেষ্টা সফল হলো। প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন ধরলেন এবং বললেন, আপনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। মন্ত্রী না থেকেও জনগণের সেবা করা যায়। জনগণের সেবা করুন।

প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন রেখে দিলেন।

গল্পের মোরাল

মন্ত্রীদের বুকে এবং পায়ে লোম না থাকা বাঞ্ছনীয়।

২৮ আগস্ট ২০১১

AMARBOI.COM

১

একা এবং একা

আমি বড় হয়েছি ভিড়ের মধ্যে।

সব সময় চারপাশে লোকজন, সব সময় হইচই। উৎসব উৎসব ভাব।

আমরা ছয় ভাইবোন। বাবার সংসারের সদস্যসংখ্যা সেই হিসাবে আট হওয়া উচিত। কিন্তু সদস্যসংখ্যা ছিল আট প্লাস টু। প্লাস টু—কারণ, আমার এক মামা এবং এক চাচাকে আমাদের সঙ্গেই থাকতে দেখেছি। তাঁদের উপস্থিতি ছিল সরব। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলেই শুনতাম, তাঁদের ঘর থেকে খটখট খটাস শব্দ আসছে। তাঁরা ক্যারম খেলছেন। এই খেলাটাকে তাঁরা প্রায় সাধনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমার নিজের যখন সংসার হলো, আমিও বাবার পথ ধরলাম। 'একটি সন্তানই যথেষ্ট'—এই স্লোগানের দিনে আমি অতি দ্রুত পৃথিবীতে চারজন সন্তান নিয়ে এলাম। বাচ্চারা আছে, তাদের বন্ধুবান্ধব আছে, বাড়ি সব সময় সরগরম। কেউ গান শুনছে, কেউ টিভিতে কার্টুন দেখছে। সব সময় উৎসব।

বেড়াতে যাওয়ার সময় হলে আমার নিজের সংসারের সঙ্গে যুক্ত করতাম ভাইবোনদের সংসার। ৩০ জনের বিশাল দল নিয়ে যাচ্ছি নেপালে, যাচ্ছি ইন্ডিয়ায়। দুই মাইক্রোবাস ভর্তি যুক্ত সংসার নিয়ে ঘুরছি দেশের ভেতর। চারপাশে মানুষজন না থাকলে অসহায় বোধ করছি। যেন আমি আলাদা কেউ না, যেন আমি ভিড়ের একজন।

অথচ মজার ব্যাপার, আমি আমার লেখালেখিতে প্রায় সময়ই একজন নিঃসঙ্গ মানুষের চরিত্র খুব যত্ন করে আঁকছি। মানুষটা থাকে একা, নিজে রান্না করে খায়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে তার ঘুম ভাঙে। সে উঠানে বসে

AMARBOI.COM

থেকে কত কী চিন্তা করে। তাকে ঘিরে থাকে আনন্দময় এক বিষাদ।

এ ধরনের চরিত্রের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। আমি আমার চারপাশে সব সময় গৃহী মানুষ দেখেছি। তাহলে লেখার সময় এ রকম চরিত্র উঠে আসছে কেন? আমার নিজের ভেতর কি একাকিত্বের কোনো ব্যাপার আছে? নিঃসঙ্গতার প্রতি লোভ আছে? আমেরিকায় একবার লেখকদের একটা সম্মেলন হলো। পৃথিবীর সব দেশের লেখকেরা সেখানে জড়ো হলেন। আমি খুবই ছোট মাপের লেখক, এটা না বুঝেই হয়তো বা তারা আমাকেও নিয়ে গেল। আমাকে থাকতে দেওয়া হলো ফিলিপাইনের একজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে। এই ঔপন্যাসিকের কাছে শুনলাম, বনের ভেতর এক পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর একটা ছোট্ট কাঠের ঘর আছে। বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময় তিনি সেখানে নির্জনবাস করেন। নিজের হাতে রান্না করে খান। সন্ধ্যার পর বাড়ির উঠোনে বসে একা একা দূরের বনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুনেই মনে হলো, বাহ্, ভালো তো! ইশ্, এ রকম একটা জীবন যদি আমার হতো!

মজার ব্যাপার হলো, সেন্ট মার্টিন দ্বীপেও আমার ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি আছে। সন্ধ্যার পর সেই বাড়ির উঠোনে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে আমিও নির্জনবাস করতে পারি। এ কাজটি কখনো করা হয়নি। যখনই সেন্ট মার্টিন গিয়েছি, একদল সফরসঙ্গী নিয়ে গিয়েছি। সদস্যসংখ্যা খুব কম করে হলেও কুড়িজন। হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচি, সমুদ্রে ঝাঁপাঝাঁপি। রীতিমতো উৎসব। আমি উৎসবের একজন। একা একা উৎসব হয় না। উৎসবের জন্যে খুব কম করে হলেও দুজন মানুষ লাগে। একাকিত্বের আনন্দের ব্যাপারটা আমার কখনো জানা হলো না।

প্রকৃতি মানুষের কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখে না। সেই কারণেই হয়তো প্রকৃতি আমার বাসনা (?) পূর্ণ করল। কিছু জটিল কারণে আমাকে যেতে হলো স্বেচ্ছানির্বাসনে। যে আমি শুধু আমার পরিবারের অংশই ছিলাম, আমার ভাইবোনদের পরিবারেও একজন ছিলাম, তাকে একা জীবনযাপন শুরু করতে হলো। বেশ বড় একটা বাড়িতে আমি একা থাকি। কোনো কাজের মানুষ নেই, রান্না করার কেউ নেই। আমি এক এবং অদ্বিতীয়। লেখালেখির সময় তৃষ্ণা পেলে কাউকে এক গ্লাস পানি দিতে বলতে পারি না। বলতে পারি না, পর্দা টেনে দাও। আমাকে ঘন ঘন চা খেতে হয়। 'আকবরের মা' নামে (?) আমাদের একটা কাজের মহিলা ছিল। সে সারাক্ষণ চুলায় ফুটন্ত পানি রাখত। চায়ের কাপে দুধ, চিনি, টি-ব্যাগ দিয়ে রাখত।

AMARBOI.COM

'আকবরের মা, আমাকে এক কাপ চা দাও'—এ বাক্যটি শেষ করবার আগেই চায়ের কাপ চলে আসত। এখানে কে আমার জন্যে চা বানিয়ে দেবে?

মানুষ খুব দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি খুব দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। ছোটখাটো সমস্যা আমি দ্রুত কাটিয়ে উঠলাম। একসময় দেখলাম, তৃষ্ণার সময় ফ্রিজ খুলে পানির বোতল আনা কিংবা হিটারে চা বানানো তেমন জটিল কর্ম না।

নির্জনবাস ইন্টারেস্টিং করার সব ব্যবস্থা করা হলো। ঘর ভর্তি করলাম ভিডিও দিয়ে। রাত জেগে বিখ্যাত সব ছবি দেখব। র‍্যাক ভর্তি হলো গানের সিডিতে। গান শোনা হবে। আর লাইব্রেরি ভর্তি বই তো আছেই। বিখ্যাত যত বই কিনে রেখেছি, পড়া হয়নি। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো'। করুণাধারার সব ব্যবস্থা হলো।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, কোনো কিছু করতেই আমার ভালো লাগছে না। ছবি দেখতে ভালো লাগছে না, গান শুনতে ভালো লাগছে না। এমনকি বই পড়ার মতো ব্যাপারেও আনন্দ পাচ্ছি না। অথচ বই তো একাই পড়তে হয়। বই তো আর দল বেঁধে পড়ার জিনিস না। আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করলাম, আমি লিখতেও পারছি না। অথচ সুমসাম নীরব বাড়ি। লেখালেখি খুব ভালো হবার কথা। বিরক্ত করার কেউ নেই। লেখার মাঝখানে কেউ এসে বলবে না, মেয়েটাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও তো।

একসময় নির্জনতা আমার ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করল। ব্যাখ্যা করে বলি। আমার মাথার ওপর যে ফ্যানটা ঘোরে তার একটা সমস্যা আছে। ঘূর্ণনের সময় সে শব্দ করে। রেলগাড়ির চাকার শব্দের মতো ছন্দোময় শব্দ। ঘুমোবার সময় আমি যদি মনে মনে বলি, 'আচ্ছা, এবার ঘুমোচ্ছি।' তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হয় ফ্যানটা তালে তালে বলছে, 'আচ্ছা, এবার ঘুমোচ্ছি,' 'আচ্ছা, এবার ঘুমোচ্ছি,' 'আচ্ছা, এবার ঘুমোচ্ছি'। যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। মিস্ত্রি ডাকিয়ে বাকপটু ফ্যানটি পাল্টে শব্দহীন ফ্যান লাগানো হলো। তখন মনে হলো আগের অবস্থাটাই তো ভালো ছিল। ফ্যানের কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া। আবার শব্দময় ফ্যান লাগানো হলো। ফ্যানের মিস্ত্রি চোখ বড় বড় করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি অনেক লোকজনের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি—এই ধারণা প্রচলিত থাকার কারণে সন্ধ্যার পরপরই আমার বন্ধুবান্ধবরা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু

AMARBOI.COM

করে। কেউ না কেউ রাতের খাবারের দায়িত্ব নেয়। প্রচুর খাবার এবং ভালো খাবার। শুরু হয় ম্যারাথন আড্ডা। আড্ডার একটা নাম দরকার। নাম দিলাম 'ওল্ড ফুলস ক্লাব'। বাংলায় 'বৃদ্ধ বোকার দল'। এই দলে অতি বিখ্যাতদের কেউ কেউ যেমন আছেন, আবার নামগোত্রহীনরাও আছেন। ক্লাবের নিয়মকানুন খুব কড়া। প্রতি মিটিংয়ে পরচর্চা করতে হবে। পরচর্চাটা হবে প্রকাশ্য। অনুপস্থিত মেম্বারদের পরচর্চা নিষিদ্ধ। 'পরচর্চা' বা 'গিবত' শব্দটা আমরা অবশ্য ব্যবহার করি না। আমরা বলি, শিক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান।

'বৃদ্ধ বোকার দল' ক্লাবের অর্ধেকের বেশির ভাগ মেম্বারের বয়স ত্রিশের নিচে। গরু যেমন শিং ভেঙে বাছুরদের দলে মিশে, এরা বাছুর বলে নকল শিং লাগিয়ে গরুদের দলে মিশছে।

আড্ডার বিষয় বেশ বিচিত্রধর্মী : সাহিত্য এবং রাজনীতি। প্রতিদিনই রাজনীতির আলোচনা জমে ওঠে এবং আমরা একসময় সিদ্ধান্ত নিই, একটা রাজনৈতিক পার্টি খুলব। পার্টির নাম 'হিমু পার্টি'। পার্টির সদস্যদের হলুদ পাঞ্জাবি পরতে হবে। আমরা ইলেকশন করব। আমাদের একটাই ম্যান্ডেট থাকবে, 'সন্ত্রাস এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ'। আমরা জনগণকে বলব, পাঁচ বছর আমাদের দেশ চালানোর সুযোগ দিন। যদি আমরা দেশ ঠিক করতে না পারি তাহলে হিমু পার্টির সব সদস্যকে নিয়ে গহিন কোনো অরণ্যে চলে যাব। বৃদ্ধ বোকাদের আড্ডায় প্রতিবারই হিমু পার্টির জন্যে কিছু চাঁদা তোলা হয়। এখন পর্যন্ত সর্বমোট সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ তিন হাজার একুশ টাকা। ছেলেমানুষি ব্যাপার তো বটেই।

আমাকে দিন কাটাতে হচ্ছে—কিছুদিন না হয় ছেলেমানুষি করেই কাটালাম। পরম করুণাময় বিভিন্ন সময় আমাকে বিচিত্র সব পরিবেশে রেখেছেন। জনতার মধ্যে আমাকে দিয়েছেন নির্জনতা, আবার নির্জনতার মধ্যে নিয়ে এসেছেন জনতা। আমি আমার নিজের সৃষ্টি করা চরিত্রের মতোই প্রায়ই গভীর রাতে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসি। জানালা খুলে আলো ঝলমল রাতের নগরী দেখে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ি। মনে মনে বলি, 'সবাই সুখে থাকুক।' আমার মনের কথাটা টেলিপ্যাথিক উপায়ে মাথার ওপরের ফ্যানটা জেনে ফেলে। সে ক্রমাগত এক মেয়েগলায় বলতে থাকে, 'সবাই সুখে থাকুক, সবাই সুখে থাকুক, সবাই সুখে থাকুক।'

১৪ ডিসেম্বর ২০০১

২

হাবলঙ্গের বাজার

হাবলঙ্গের বাজার হলো শেষ বিচারের দিনের *মেটাফর*। এই নামে ঈদের নাটক বানাচ্ছি। বড় বড় সব অভিনেতা-অভিনেত্রী কাজ করছেন। নাটকে নাপিতের একটি চরিত্র আছে। এই চরিত্রের জন্য কাউকে ডাকা হয়নি। কারণ আমার মাথায় অন্য পরিকল্পনা আছে। চ্যালেঞ্জার এসেছে তার স্ত্রীকে নিয়ে নাটকের নির্মাণ দেখতে। আমার চোখ চ্যালেঞ্জারের দিকে।

নাপিতের অংশটি শুরু করার মুহূর্তে চ্যালেঞ্জারকে ডেকে বললাম, এসো, নাপিতের অভিনয় করো।

সে আকাশ থেকে নয়, অন্য গ্যালাক্সি থেকে পড়ল। হতভম্ব গলায় বলল, স্যার, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আমি বললাম, কোনো কথা নয়। ধুতি পরো। ক্ষুর হাতে নাও।

চ্যালেঞ্জারের অভিনয়জীবনের এই হলো শুরুর গল্প। এর পরপরই তাকে এক ঘণ্টার একটা নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ডাকি। নাটকের নাম *খোয়াব নগর*। *খোয়াব নগর*-এ আমার মেজো মেয়ে শীলা অভিনয় করেছিল। নাটকের শুটিংয়ের এক ফাঁকে শীলাকে বললাম, মা, সম্পূর্ণ নতুন এই অভিনেতার অভিনয়ক্ষমতা কেমন?

সে বলল, খুব ভালো।

আমি বললাম, 'খুব ভালো' কোনো কাজের কথা নয়। আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে তুলনা করো।

সে বলল, তাঁর অভিনয়ক্ষমতা কোনো অংশেই নূর চাচার চেয়ে কম নয়।

শুরু হলো সাধারণ এক প্রেসমালিকের অভিনয়জগতে দৃপ্ত পদচারণ।

সবাই বলবে, বাংলাদেশ একজন বড় অভিনেতাকে হারাল। আমি বলছি, আমরা একজন ভালো মানুষ হারিয়েছি। অভিনেতা তৈরি করা যায়। ভালো মানুষ তৈরি করা যায় না। তৈরি করা গেলে আমি ভালো মানুষ তৈরির একটা স্কুল দিতাম।

চ্যালেঞ্জারের বিষয়ে আমার অনেক স্মৃতি আছে। একটি উল্লেখ করছি। আমরা দল বেঁধে বেড়াতে গেছি চীনের বেইজিং শহরে। যাওয়ার পথে হংকংয়ের ডিজনিল্যান্ড দেখার জন্য যাত্রাবিরতি। চ্যালেঞ্জার ও তার স্ত্রী

AMARBOI.COM

ডিজনিল্যান্ডের কর্মকাণ্ড দেখে মুগ্ধ। আমরা লাইন বেঁধে বসেছি ডিজনিল্যান্ডের বিখ্যাত *কার্টুন ক্যারেক্টার শো* দেখব। শো শুরু হতেই দেখি চ্যালেঞ্জার ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। তার স্ত্রী তাকে সামলানোর চেষ্টা করছে, পারছে না।

আমি বললাম, চ্যালেঞ্জার, কী সমস্যা?

চ্যালেঞ্জার কাঁদতে কাঁদতে বলল, এত সুন্দর একটা দৃশ্য আমার বাচ্চা দুটি দেখতে পারছে না। তাদের নিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল, টিকিটের টাকা জোগাড় করতে পারিনি। এই দুঃখে আমি কাঁদছি।

চ্যালেঞ্জার হয়তো পৃথিবীর যেকোনো দৃশ্যের চেয়ে সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখছে। তার বাচ্চা দুটি সেই দৃশ্য দেখতে পারছে না। এবারও কি চ্যালেঞ্জার কাঁদবে? না, কাঁদবে না। চ্যালেঞ্জার চাইবে, অকরুণ এই পৃথিবীতে তার দুই সন্তান যেন পূর্ণ জীবন পায়। অনুপস্থিত বাবার ভালোবাসা যেন তাদের ঘিরে থাকে।

তার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে। তার স্ত্রীকে আমি ডাকি 'চ্যালেঞ্জারনি'। তার আসল নাম ঝর্না। সে যে আদর, মমতা ও ভালোবাসা নিয়ে চ্যালেঞ্জারের পাশে ছিল, তার তুলনা নেই।

চ্যালেঞ্জার দুর্ভাগ্যের সন্তান। অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে তার একটি সৌভাগ্য হলো, সে ঝর্নার মতো একজন স্ত্রী পেয়েছিল। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন বিখ্যাত অভিনেতার এক অখ্যাত স্ত্রীর চোখের জল কমাতে সাহায্য করেন। আমিন।

২১ অক্টোবর ২০১০

AMARBOI.COM

৩

বসন্ত বিলাপ

তখন চিটগং কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি। ক্লাসটিচার বড়ুয়া স্যার আমাদের বাংলা পড়ান। স্যার একদিন ক্লাসে এসে বললেন, 'রচনা লেখো "আমার প্রিয় ঋতু"।' এই বলেই চেয়ারে পা তুলে তিনি ঘুমের প্রস্তুতি নিলেন। আমাদের সময়ে ক্লাসওয়ার্ক দিয়ে শিক্ষকদের ঘুমানো এবং ঝিমানো

স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এটাকে কেউ দোষের ধরত না। ছাত্ররা তো ক্লাসওয়ার্ক করছেই।

খাতা খুলে বসে আছি, আমার প্রিয় ঋতু কী বুঝতে পারছি না। শীত হওয়ার সম্ভাবনা কি আছে? শীতের সময় আমরা নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে যাই। তখন লেপ নামানো হয়। লেপের ভেতর হুটোপুটি। রাতের উঠানে আগুন জ্বেলে চারদিকে গোল হয়ে বসে ভূতের গল্পের আসর। দিনের বেলা ডোবা সেঁচে মাছ ধরা।

প্রিয় ঋতু 'শীত' নিয়ে রচনা লেখা শেষ হলো। ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, এক্ষুনি ঘণ্টা পড়বে। এ অবস্থায় কারোর রচনাই স্যারের পড়ার সময় নেই। আমরা আনন্দিত। হঠাৎ স্যার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখি কী লিখেছিস?'

আমি ভয়ে ভয়ে খাতা দিলাম। স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, 'প্রিয় ঋতু হবে ঋতুরাজ বসন্ত। তুই লিখেছিস শীত। গাধা, কানে ধর।'

আমি কানে ধরতেই ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল। ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় রচনা ছিল 'তোমার প্রিয় ঋতু'। এইবার আর ভুল হলো না, লিখলাম ঋতুরাজ বসন্ত। রচনার ফাঁকে ফাঁকে কোটেশন ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। কোটেশন দেওয়া মানেই ছাঁকা নম্বর।

ঋতুরাজ বসন্ত নিয়ে লেখা কারও কোনো কবিতা মনে না পড়ায় নিজেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেলাম। লিখলাম—ঋতুরাজ বসন্তের রূপে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'কত অপূর্ব পুষ্পরাজি ঋতুরাজ বসন্তে ফুটিয়াছে।'

বালক বয়সে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বসন্তবিষয়ক একটি উদ্ধৃতি (আমার অতি প্রিয়) এখন দিচ্ছি—

আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে
এত বাঁশি বাজে
এত পাখি গায়।

তিনটি মাত্র লাইনে বসন্ত উপস্থিত। বাঁশি বাজার শব্দও কানে আসা শুরু হয়েছে। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় ঋতু কি বসন্ত? তাঁর বসন্তবিলাপ দেখে আমি অবাকই হই। এই ব্যাকুলতার কারণ কী? বঙ্গদেশে শীত প্রায় নেই বলেই বসন্তও নেই। আমাদের অল্প কিছু পাতাঝরা বৃক্ষ, পত্রহীন গাছে বসন্তকালে নতুন পাতা আসার ব্যাপারটা সে জন্যই অনুপস্থিত বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন শালবনের ভেতর। শালবনে বসন্তকালে নতুন

AMARBOI.COM

পাতা আসে—এই দৃশ্য অবশ্যই সুন্দর। তখন কিন্তু পুরোনো পাতা ঝরতে থাকে। এই দৃশ্য অতি বিরক্তিকর।

এমন কি হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের বসন্তবিলাসের পরোক্ষ কারণ পশ্চিমের দেশ? যৌবনে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের দেশে কাটিয়েছেন। তিনি দেখেছেন ভয়ংকর শীতের পর আনন্দময়ী বসন্তের আগমনের সর্বজনীন উচ্ছ্বাস। এই থিওরি বাতিল। রবীন্দ্রসাহিত্য পশ্চিমের প্রভাবমুক্ত। অবশ্যি সমালোচকেরা বলেন, ছোটগল্প লেখার প্রেরণা তিনি পেয়েছেন পশ্চিমা ছোটগল্প পড়ে। তাঁর প্রিয় ছোটগল্পকার এডগার এলেন পো।

সমালোচকেরা কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে কোনো লেখকের ওপর অন্যের প্রভাব প্রমাণ করতে পারলে বিমলানন্দ উপভোগ করেন। আমি সমালোচক নই বলেই কারও লেখার ওপরই অন্যের প্রভাব পাই না। আর রবীন্দ্রনাথ তো সবার উর্ধ্বে। তাঁর কত কবিতায় বৃষ্টির বন্দনা আছে। তিনি অসংখ্যবার পশ্চিম দেশের অপূর্ব তুষারপাত দেখেও এই নিয়ে কাব্য রচনা করেননি।

অন্যদিকে আমাদের জীবনানন্দ দাশের পশ্চিমা সাহিত্যের মুগ্ধতা চলে এসেছে তাঁর কাব্যে। তিনি হয়ে গেছেন হেমন্তের কবি। তাঁর হেমন্ত বঙ্গদেশের হেমন্তও না, পশ্চিমা হেমন্ত। ফুল ও পাখির বসন্ত জীবনানন্দকে ছুঁয়ে যেতে পারেনি।

বসন্ত এসেছে—এই খবর আমি পাই 'নুহাশ পল্লী'তে। খবরটা আমাকে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। নুহাশ পল্লীতে তাঁর অতিপ্রিয় ফুল নীলমণিলতা ফোটে বসন্তকালে। নীলমণিলতা নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। বোটানিক্যাল নাম *Patraea volobilis*। নুহাশ পল্লীতে বাগানবিলাপ বসন্তেই হেসে ওঠে। বাগানবিলাপ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম। অন্য নাম Bougain Villea। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা মাধুরীর নামে একটি লতানো গাছের নাম রেখেছেন মাধুরীলতা। এই গাছে ফুল বর্ষাকালে আসে কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে নুহাশ পল্লীতে বসন্তকালে মাধুরীলতা ফুলে ফুলে ভরে যেতে দেখেছি। মাধুরীলতার ইংরেজি নাম *Quisquallis Indica*।

বসন্ত মানেই পাখির গান ('এত পাখি গায়'), মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো করে ডাকে বউ কথা কও পাখি। এক্ষুনি বউ কথা না বললে সে মারা যাবে অবস্থা। এ কারণেই 'বউ কথা কও' পাখির আরেক নাম ব্রেইন ফিভার বার্ড। নজরুলের গানে এই পাখি বারবার এসেছে। বউ কথা কও নামে না, পাপিয়া নামে। বসন্তকালেই শিস দিতে শুরু করে কুটুম পাখি। বনফুল বলেন, 'খোকা হোক পাখি।' শ্যামা পাখির গান গাওয়ার সময়ও বসন্তকাল। কোকিল

AMARBOI.COM

ও দোয়েলের কথা তো বলাই হলো না। এরাও বসন্তের পাখি। (যেসব পাঠক বসন্তের পাখি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চান, তাঁরা পক্ষীবিশারদ সাদত সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্লাব। বসন্তকালে তিনি পাখির গান শোনার জন্য ক্যাসেট রেকর্ডার নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘোরেন।)

নুহাশ পল্লীতে বসন্তের দিন হলো পাখিদের জলসার দিন। কাঠঠোকরা পাখি যে ঠকঠক শব্দের বাইরে গানও করতে পারে, তা আমি নুহাশ পল্লীতে এক বসন্তে প্রথম শুনি। এই পাখি দেখতে যেমন সুন্দর, তার গানের গলাও অদ্ভুত। কাক বসন্তকালে চুপ করে যায়। কা কা কম করে। মনে হয় অন্য পাখিদের, বিশেষ করে তার চিরশত্রু কোকিলের হইচইয়ে বিরক্ত হয়ে চুপ করে যায়। বসন্তে কাকের নীরবতার তথ্যটা মজার না?

রবীন্দ্রনাথকে যদি তাঁর প্রিয় ঋতু নিয়ে রচনা লিখতে বলা হতো, তিনি কি বসন্ত নিয়ে লিখতেন? বসন্ত নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস দেখে এ রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বঙ্গদেশের প্রতিটি ঋতুর প্রতিই ছিল তাঁর সীমাহীন উচ্ছ্বাস। যিনি লেখেন, 'বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান', তাঁর প্রিয় ঋতু তো বর্ষা। বর্ষার বর্ণনায় তিনি সেই সব পাখির নাম নিয়েছেন, যারা জলচর এবং শুধু বর্ষাতেই গান করে (ডাহুক, মাছরাঙা, সারস, বকপক্ষী)। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের বাইরে যাওয়ার উপায় এ দেশের প্রকৃতির ছিল না, আর ছিল না বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।'

AMARBOI.COM

পাদটীকা

এক চৈত্র মাসে আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। রোদের তাপে প্রকৃতি ঝলসে যাচ্ছে। মাটি ফেটে চৌচির, আকাশ পিঙ্গল। হঠাৎ দেখি একটা শিমুলগাছ। গাঢ় লাল রঙের ফুল এমনভাবে ফুটেছে যে মনে হয় রোদের তাপে গাছে আগুন লেগে গেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে গাছের নিচে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে শুনি, পটকা ফোটার মতো শব্দ হচ্ছে। শিমুল ফুল গুলির মতো শব্দ করে ফাটে এবং বীজ থেকে বের হয়ে ছোট্ট মেঘের মতো তুলা বাতাসে উড়তে থাকে। এই দৃশ্য প্রথম দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। বসন্ত! তোমাকে অভিবাদন।

০৮ এপ্রিল ২০১১

৪

আমার বাবার জুতা

বিজয় দিবসের কত সুন্দর সুন্দর স্মৃতি মানুষের আছে। সেসব স্মৃতিকথা অন্যকে শোনাতে ভালো লাগে। প্রেমিকার প্রথম চিঠি পাওয়ার গল্প বলার সময় যেমন রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, বিজয় দিবসের গল্প বলার সময়ও তা-ই হয়। আমার বন্ধু *দৈনিক বাংলার* সালেহ চৌধুরীকে দেখেছি বিজয় দিবসের স্মৃতিকথা বলার সময় তাঁর চোখে পানি এসে পড়ে। যদিও তেমন কিছু উল্লেখ করার মতো স্মৃতি নয়। তিনি তাঁর মুক্তিযোদ্ধা দলবল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। যুদ্ধের অবসান হয়েছে, আর গুলি ছুড়তে হবে না। তিনি রাইফেল ছুড়ে ফেলে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে শুরু করলেন। এই গল্প বলার সময় কেউ কাঁদতে শুরু করলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমার দূর সম্পর্কের এক চাচা বিজয় দিবসের স্মৃতি এভাবে বলেন, খবরটা শোনার পরে কানের মধ্যে 'তব্দা' লেগে গেল। আর কিছুই কান দিয়ে ঢোকে না। আমি দেখছি সবার ঠোঁট নড়ে, কিন্তু কিছু শুনি না। আজব অবস্থা।

১৬ ডিসেম্বর কাছাকাছি এলেই পত্রিকাওয়ালারা বিজয় দিবসের স্মৃতিকথা ছাপানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা কখনোই ভাবেন না, সেদিনের কথা যথাযথভাবে বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সেদিন আমরা সবাই ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘোরের স্মৃতি হলো এলোমেলো স্মৃতি। ঘোরের কারণে তুচ্ছ জিনিসকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। মস্তিষ্ক খুব যত্ন করে তার মেমরি সেলে তুচ্ছ জিনিসগুলো রেখে দেয়। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সে অদরকারি মনে করে ফেলে দেয়।

একজন মাতালকে নেশা কেটে যাওয়ার পর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নেশা করার ওই রাতে তুমি মদ্যপান ছাড়া আর কী করেছিলে? সে পরিষ্কার কিছু বলতে পারবে না। বলতে পারার কোনো কারণ নেই। বিজয় দিবসে আমরা সবাই এক প্রচণ্ড নেশার মধ্যে ছিলাম। কাজেই, হে পত্রিকা সম্পাদক, আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। জিজ্ঞেস করলেই আমরা উল্টাপাল্টা কথা বলব। আপনার ধারণা হবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি।

AMARBOI.COM

কিন্তু আমরা কেউ মিথ্যা বলছি না। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কি আর মিথ্যা গল্প করা যায়?

আজ আমি বিজয় দিবসের স্মৃতির গল্প করব না। আমি বরং আমার বাবাকে নিয়ে একটি গল্প বলি। এই মহান ও পবিত্র দিনে গল্পটি বলা যেতে পারে।

আমার বাবার এক জোড়াই জুতা ছিল। লাল রঙের চামড়ার জুতা। মাল্টিপারপাস জুতা। সাধারণভাবেও পরতেন, আবার তাঁর পুলিশের ইউনিফর্মের সঙ্গেও পরতেন। জুতা জোড়ার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত। কারণ, আমাদের প্রায়ই তাঁর জুতা কালি করতে হতো। কাজটা আমাদের খুব পছন্দের ছিল। জুতার কালির গন্ধটা খুব মজা লাগত। আবার ব্রাশ ঘষতে ঘষতে জুতা যখন ঝকঝকে হয়ে উঠত, তখন দেখতে ভালো লাগত। সবচেয়ে বড় কথা, ঝকঝকে জুতা দেখে বাবা বলতেন, 'আরে বাপ রে, এক্কেবারে আয়না বানিয়ে ফেলেছে।' এই বাক্যটি শুনতেও বড় ভালো লাগত।

১৯৭১ সালের ৫ মে আমার বাবা তাঁর লাল জুতা পরে বরিশালের গোয়ারেখো গ্রাম থেকে বের হলেন। সেদিন জুতা জোড়া কালি করে দিল আমার ছোট বোন। বাবা যথারীতি বললেন, 'আরে বাপ রে, এক্কেবারে আয়না বানিয়ে ফেলেছিস দেখি।' সেই তাঁর জুতা পরে শেষ বের হয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যার সময় খবর এল বলেশ্বর নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে মিলিটারিরা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। মানুষকে যে এত সহজে মেরে ফেলা যায়, তা আমার মা তখনো জানতেন না। তিনি খবরটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি আমাদের ডেকে বললেন, তোরা এই লোকগুলোর কথা বিশ্বাস করিস না। তোর বাবা সারা জীবনে কোনো পাপ করেনি। এ রকম মৃত্যু তাঁর হতে পারে না। তোর বাবা অবশ্যই বেঁচে আছেন। যেখানেই থাকুন তিনি যেন সুস্থ থাকেন, এই দোয়া কর। আমি জানি, তোর বাবার সঙ্গে তোদের আবার দেখা হবে, অবশ্যই হবে।

একজনের বিশ্বাস অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আমরা সবাই মায়ের কথা বিশ্বাস করলাম। এর মধ্যে মা এক রাতে স্বপ্নেও দেখলেন, মিলিটারিরা বাবাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে সেখানের এক জেলে আটকে রেখেছে। বাবা স্বপ্নে মাকে বললেন, 'দেশ স্বাধীন হলেই এরা আমাকে ছেড়ে দেবে। তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। এই কদিন একটু কষ্ট করে থাকো।'

AMARBOI.COM

মা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুই খেতে পারতেন না। এই স্বপ্নের পর আবার অল্পস্বল্প খেতে শুরু করলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম স্বাধীনতার দিনটির জন্য। আমরাও মায়ের মতোই ধরে নিয়েছিলাম, দেশ স্বাধীন হলেই বাবাকে পাওয়া যাবে। মায়ের প্রতি আমাদের এই অবিচল বিশ্বাসের কারণও আছে। আমার মা কখনোই তাঁর ছেলেমেয়েদের কোনো ভুল আশ্বাস দেননি।

আমরা তখন গ্রামে পালিয়ে আছি। মে মাস প্রায় শেষ হতে চলছে। ঘোর বর্ষা। দিনের পর দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন অদ্ভুত একটা খবর পাওয়া গেল। এক লোক নাকি বলেশ্বর নদী দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা লাশ তুলে কবর দিয়েছে। তার ধারণা, এটা পিরোজপুরের পুলিশপ্রধান ফয়জুর রহমান আহমেদের লাশ। সে লাশটা কবর দিয়েছে, তবে প্রমাণের জন্য লাশের পা থেকে জুতা জোড়া খুলে রেখেছে। এই জুতা জোড়া সে আমাদের হাতে তুলে দিতে চায়। আমার মা বললেন, অসম্ভব। এটা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কারও জুতা। তবু পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমাকে জুতা আনতে শহরে পাঠালেন। আমাকে পাঠানোর কারণ হলো, আমার মায়ের ধারণা আমি খুব ভাগ্যবান ছেলে। আমি কখনো অমঙ্গলের খবর আনব না।

মিলিটারিতে তখন পিরোজপুর গিজগিজ করছে। এই অবস্থায় কোনো যুবক ছেলের শহরে ঢোকা মানে জীবন হাতে নিয়ে ঢোকা। তার ওপর শুনেছি, মিলিটারিরা আমাকে এবং আমার ছোট ভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি শহরে গেলাম লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং টুপি মাথায় দিয়ে। যেন কেউ চিনতে না পারে। ওই লোককে খুঁজে বের করলাম। আমাকে জুতা জোড়া দেওয়া হলো। হ্যাঁ, আমার বাবারই জুতা। ভুল হওয়ার কোনোই কারণ নেই। জুতা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরলাম। আমার মা জুতা দেখলেন, তিনিও বুঝলেন এটা কার জুতা, তার পরও বিশ্বাস করলেন না। এক রকম জুতা তো কত মানুষেরই থাকতে পারে। তিনি আমাদের বললেন, জুতা দেখে তোরা মন খারাপ করিস না। এটা মোটেই কোনো জোরালো প্রমাণ না। জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে এক কোনায় রেখে দেওয়া হলো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর মা ঢাকা থেকে পিরোজপুর গেলেন। নদীর পাড়ে যেখানে বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে, সেই জায়গা নিজে উপস্থিত থেকে খোঁড়ালেন। কবর থেকে লাশ তোলা হলো। শরীর পচে গলে গেছে, কিন্তু নাইলনের মোজা অবিকৃত। মা পায়ের মোজা,

AMARBOI.COM

দাঁত, মাথার চুল দেখে বাবাকে শনাক্ত করলেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর স্বামী বেঁচে নেই।

তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন, আমাদের যে এত দিন মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমার সবচেয়ে ছোট বোনটি অসুস্থ। সে কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। মা আমার ছোট ভাইকে বললেন, তাকে যেন বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা হয়।

সন্ধ্যাবেলা মা কাগজের মোড়ক থেকে জুতা জোড়া বের করলেন। অনেক সময় নিয়ে পরিষ্কার করলেন। লাল কালি কিনে এনে জুতা কালি করা হলো। আমরা দেখলাম, তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে জুতা জোড়া রাখা হয়েছে। সেই রাতে তিনি বাবার জুতা জোড়া জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুতে গেলেন।

আজকের এই মহা আনন্দের দিনে আমি আপনাদের আমার একটি ব্যক্তিগত কষ্টের গল্প বললাম। আমার এই কষ্ট যেন আপনাদের আনন্দকে কোনোভাবেই ছোট না করে। আজকের দিনে কষ্টের কোনো স্থান নেই। আমার বাবা এই দেশকে ভালোবেসেছিলেন। আমিও বাসি। অবশ্যই আমার ছেলেমেয়েরাও বাসবে। আজকের দিনে এই ভালোবাসাই সত্য, আর সব মিথ্যা।

প্রতিবছর বিজয় দিবস আসে, আমি নিজের হাতে বাসায় একটা পতাকা টানাই। পতাকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে বড় ভালো লাগে। আমার কী সৌভাগ্য, স্বাধীন দেশের পতাকা নিজের হাতে ওড়াচ্ছি।

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি
লীলা তব
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ জীবন
নব নব ॥

২১ জুলাই ২০১২, পুনর্মুদ্রণ

AMARBOI.COM

১

আজি এ বসন্তে

অদ্ভুত এক বসন্ত এসেছে বাংলাদেশে। বসন্তের এই রূপ রবীন্দ্রনাথ জানতেন না। 'বিশ্বকাপ ক্রিকেট বসন্ত' তাঁর সময়ে ছিল না। আচ্ছা, ধরা যাক তিনি এই সময়ে বাস করছেন, তাহলে কী করতেন? নিশ্চয়ই ক্রিকেট বোর্ড বিশেষ ভিআইপি এসি বক্সে তাঁকে মাঠে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করত। তিনি আধশোয়া হয়ে বসতেন আরামকেদারায়।

কবি নজরুল এসবের ধার ধারেন না। তিনি বসতেন গ্যালারিতে। বল আকাশপথে বাউন্ডারির বাইরে গেলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতেন, ছক্কা! ছক্কা! বিশ্বকাপের থিম সং লেখার এবং তাতে সুর দেওয়ার দায়িত্ব কবি নজরুল আগ্রহ নিয়ে নিতেন বলে আমার ধারণা। 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' জাতীয় লাইন সেই থিম সং-এ থাকত।

জয়ধ্বনি করার জন্য আমরা প্রস্তুত। প্রথম খেলায় ভারতীয়রা যখন চার মারবে বা ছক্কা মারবে, আমরা জয়ধ্বনি করব। আমরা যখন চার বা ছক্কা মারব, তখন যা করার তার নাম 'হুংকার'। জয়ধ্বনিতে আমাদের পোষাবে না।

প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামে গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ হতো। মরণপণ সেই যুদ্ধ দেখে আনন্দে আধপাগল হতো রোমের জনগণ এবং রোমসম্রাট। এখন আমাদের সময় আমরা গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ দেখব। বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটরদের উল্লাস এবং পরাজিতদের মানসিক মৃত্যু দেখে রোমের মানুষদের মতোই আনন্দে আত্মহারা হব।

কত না নাটক হবে খেলায়! নিশ্চিত ক্যাচ শেষ মুহূর্তে হাত থেকে ফসকে পড়ে যাবে। আম্পায়ার ভুল এলবিডব্লিউ দেবেন; হতাশ ও দুঃখী চোখে ব্যাটসম্যান তাকিয়ে থাকবেন আম্পায়ারের দিকে। বোঝাপড়ার অভাবে দুই

ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন এবং...।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য ক্রিকেটাররা নানান ধরনের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে যান। আমরা যারা খেলব না, দেখব, তাদেরও নানান প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেনার ভেতর দিয়ে প্রস্তুতির শুরু। ভাগ্যবতী যেসব তরুণী টিকিট পেয়ে গেছে, তাদের দ্বিতীয় দফার প্রস্তুতি—পোশাক কোনটা পরা হবে, কী রং হবে সেই পোশাকের; গালে বাংলাদেশের পতাকার ছবি থাকবে, নাকি শহীদ মিনারের ছবি থাকবে।

যাঁরা টিকিট পাননি, ঘরে বসে খেলা দেখবেন, তাঁদেরও কিন্তু প্রস্তুতি আছে। আমার নিজের কথা বলি। শোবার ঘর থেকে বড় টিভি নিয়ে আসা হয়েছে ড্রয়িংরুমে। বন্ধুবান্ধব সবাই একসঙ্গে বসে খেলা দেখবে। অনেক জায়গা দরকার। সোফা সরিয়ে ড্রয়িংরুম খালি করা হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও যেন খেলা দেখতে পারি, তার জন্য জেনারেটর থেকে আলাদা লাইন নেওয়া হয়েছে। স্ন্যাকস ও খাবারদাবারের দায়িত্ব এক বন্ধু নিয়েছেন। বাঘের ছবি আঁকা কেকের অর্ডার দিয়ে রাখা হয়েছে। কেকের লেখাটা ইন্টারেস্টিং, 'সাবাস বাংলাদেশ'-এর জায়গায় লেখা থাকবে 'সাবাস বাংলাদেশ'। যদি গত বিশ্বকাপের মতো প্রথম খেলাতে জিতে যাই! এত রাতে কোথায় কেক পাব?

কেমন খেলবে আমাদের ছেলেরা? প্রচণ্ড মানসিক চাপ নিয়ে যতটা ভালো খেলা যায়, ততটাই খেলবে। আমরা যারা খেলছি না, শুধুই দর্শক, তারাই প্রচণ্ড মানসিক চাপে আছি। ওরা থাকবে না? তবে আমাদের ছেলেরা ভালো খেলুক বা খারাপ খেলুক, আমরা আছি তাদের সঙ্গে; ভবিষ্যতেও থাকব।

ক্রিকেট খেলা নিয়ে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা দিয়ে লেখা শেষ করি। আমি দলবল নিয়ে গেছি সুইজারল্যান্ড। টেলিফিল্মের শুটিং। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের ওয়ানডে ম্যাচ পড়ে গেল। আগে একবার অস্ট্রেলিয়া আমাদের কাছে হেরেছে। এবারও হয়তো হারবে। এই খেলাটা দেখতেই হবে। সমস্যা হচ্ছে, সুইজারল্যান্ডে কেউ ক্রিকেট দেখে না, সবাই দেখে ফুটবল। চ্যানেল আইয়ের হাসানকে বললাম, তুমি তো অসাধ্য সাধন করতে পারো। আমাকে খেলা দেখার ব্যবস্থা করে দাও।

হাসান বিশাল বাস ভাড়া করল। আমরা বাসে চড়ে রওনা হলাম জুরিখে। এখানে অনেক বাংলাদেশি পরিবার আছে। তাদের বাসায় নিশ্চয়ই ক্রিকেট দেখার ব্যবস্থা থাকবে। কোথাও সে রকম পাওয়া গেল না। একজন সন্ধান দিল অস্ট্রেলিয়ান একটা পাব আছে, সেখানে হয়তো ক্রিকেটের চ্যানেল আছে। আমরা দল বেঁধে সেখানে উপস্থিত হলাম। এখানেও চলছে ফুটবল। পাবের

AMARBOI.COM

মালিককে হাসান বলল, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমরা ক্রিকেটে ওয়ানডেতে তোমাদের হারিয়েছি। আজ আবার হারাব। আমাদের খেলা দেখার ব্যবস্থা করে দাও।

পাবের মালিক ব্যবস্থা করল এবং আমাদের সঙ্গে নিজেও খেলা দেখতে বসল। প্রথম ব্যাটিং বাংলাদেশের। একের পর এক ব্যাটসম্যান আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই খেলা দেখা মানে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। পাবের মালিক বক্র হাসি হেসে বলল, তোমরা কি জিতেছ?

আমি বললাম, ইয়েস।

দলের সবাই আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল, ইয়েস।

আমরা বীরদর্পে পাব ছেড়ে বের হলাম। পাব মালিক তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

বিশ্বক্রিকেটের আনন্দযজ্ঞে আজ আমাদের সবার নিমন্ত্রণ। নগরী সেজেছে নতুন সাজে। তার পালে লেগেছে ক্রিকেট বসন্তের হাওয়া। চারদিকে কত না আনন্দ! বিশ্বক্রিকেটের আনন্দযজ্ঞে আজ আমাদের সবার নিমন্ত্রণ।

এত ফুল ফোটে
এত বাঁশি বাজে
এত পাখি গায়
আহা, আজি এ বসন্তে।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

AMARBOI.COM

২

বাংলা ধোলাই

তেত্রিশটা কামান নিয়ে বসে আছি

এবারের বিশ্বকাপের প্রথম খেলা বাংলাদেশের। এই খেলা কীভাবে দেখা হবে, তা নিয়ে *প্রথম আলো*তে একটা লেখা লিখেছিলাম। লেখা ব্যাকফায়ার করল। আমার সঙ্গে খেলা দেখার জন্য পরিচিত-অপরিচিত লোকজন টেলিফোন করা

শুরু করল। আমার সঙ্গে খেলা দেখতে হলে তো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার প্রয়োজন নেই। বাধ্য হয়ে ভেন্যু পাল্টালাম। নিজের বাসা ছেড়ে প্রকাশক-বন্ধু আলমগীর রহমানের বাসায় উপস্থিত হলাম। আমি, শাওন এবং পুত্র নিষাদ। তিনজনের গায়েই বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের জার্সি (জার্সি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে)।

আলমগীর রহমান বললেন, 'আপনারা তিনজন? আর কেউ আসবে না তো? আপনি তো দলবল ছাড়া চলেন না। আমি এত মানুষকে জায়গা দিতে পারব না।'

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, 'আমরা তিনজনই।'

আড়াইটা থেকে খেলা শুরু। দুপুর দুইটার মধ্যে আলমগীরের বসার ঘরে ভিড় জমে গেল। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই উপস্থিত। অপরিচিত কিছু লোকজনও আছে। সবার গায়েই বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের জার্সি। যারা জার্সি ছাড়া উপস্থিত হয়েছে, তারা ব্যাপার দেখে ছুটে গেল জার্সি কিনে আনতে। উৎসাহ-উত্তেজনায় সবাই ঝলমল করছে। কত আলোচনা, কত হিসাব-নিকাশ!

খেলা শুরু হওয়ার আগে 'বাংলাদেশ কেমন খেলবে'—এই বিষয়ে আলোচনা সভা। এই সভায় প্রত্যেকেই মতামত দেবে।

বন্ধু-আর্কিটেক্ট করিম বলল, 'গো-হারা হারবে। ইন্ডিয়ার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।' করিম একজন ক্রিকেটবোদ্ধা। ক্রিকেটবোদ্ধারা খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেক ভালো ক্রিকেট বোঝে। ক্রিকেট কমেনটেটরদের চেয়েও এরা জ্ঞানী হয়ে থাকে।

অন্যপ্রকাশের কমল বলল, বাংলাদেশ হারবে, তবে হার্ড কনটেস্ট হবে। কমল ক্রিকেটবোদ্ধা প্লাস ক্রিকেট-রেকর্ড বিশেষজ্ঞ। কবে কোন খেলায় কে শূন্য রানে আউট হয়েছে, কমল বলে দেবে।

করিম বলল, কোনো কনটেস্টই হবে না। ইন্ডিয়া আগে ব্যাট করলে সাড়ে তিন শ রান করবে। রানের হিমালয় পর্বত দেখে বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা চুপসে যাবে। দুই শ রানে অলআউট।

আমি মন খারাপ করে দেখলাম, ক্রিকেট-বিজ্ঞজনেরা ইন্ডিয়া জিতবে বলে দিচ্ছেন, আর আমরা যারা ক্রিকেট কিছুই বুঝি না—যেমন আমি এবং আমার চার বছর বয়সী পুত্র—বলছি, 'বাংলাদেশ জিতবে।'

পুত্র নিষাদের চেয়ে আমি তিন কাঠি ওপরে। আমি বললাম, বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে বাংলাধোলাই দিয়ে দেবে। দশ উইকেটে জিতবে। দশ উইকেটে

AMARBOI.COM

জেতা মানে বাংলাধোলাই।

করিম বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি ক্রিকেট বোঝো না, কেন কমেন্ট করো? প্লিজ, স্টপ।'

টস হয়ে গেছে। বাংলাদেশ টসে জিতেও নিল ফিল্ডিং।

করিম মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'সাকিব, তুই করলি কী! নিজের পায়ে নিজে ইলেকট্রিক করাত চালালি! ইন্ডিয়ার যেমন ব্যাটিং লাইন, ওরা করবে চার শ রান। তোরা তো দেড় শও করতে পারবি না!'

আলমগীর রহমান বললেন, 'করিমের সঙ্গে আমি এক শ ভাগ একমত। সাকিবের ভুল ডিসিশনের জন্য আমরা হারলাম। পুলাপান ক্যাপ্টেন হয়ে গেলে যা হয়।'

ওদের কথাবার্তা শুনে আমিও ওদের বাতাসে পাল তুললাম। ক্রিকেট অনেকটা মানসিক খেলা। বিশাল রানের পাহাড় দেখে যেকোনো দলই ফুটা বেলুনের মতো চুপসে যাবে।

শাওন বলল ভিন্ন কথা। সে বলল, 'দলের ক্যাপ্টেন কোনো কিছু না ভেবেই ফিল্ডিং নেবেন, তা হয় না। নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত তাঁর একার না। সবাই মিলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে। আমার মন বলছে, আমরা এবারও ভারতকে হারাব।'

করিম বলল, 'ইন্ডিয়া হারলে আমি কান কেটে ফেলব। ক্রিকেট বোঝে না এমন কারও সঙ্গে খেলা দেখাই ঠিক না।'

করিমকে কান কাটতে হলো না। ইন্ডিয়া জিতল।

আমি বললাম, 'ইন্ডিয়া যেমন জিতেছে, আমরাও জিতেছি। তিন শ সত্তর রানের বিপরীতে দুই শ তিরাশি রান মানেই বিজয়। বিশাল বিজয়!'

ক্রিকেট খেলা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্যের সঙ্গে কেউ একমত হয় না। প্রথমবার সবাই একমত হলো। সবাই (অক্ষতকর্ণ করিমসহ) বলল, বাংলাদেশ হারেনি।

বাংলাদেশের বিজয় উপলক্ষে আমরা 'আমার সোনার বাংলা' গান গাইলাম। এগারোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আইসক্রিম কেক কাটা হলো।

এগারোটা মোমবাতি প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল, অনেক দিন ধরেই আমি 'এগারো'র রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছি, পারছি না। ক্রিকেট এগারোজন কেন খেলে? বারোজন না কেন বা দশজন না কেন? ফুটবলেও এগারোজন, হকিতেও এগারো। এই এগারো কবে শুরু হলো, বা কেন শুরু হলো?

AMARBOI.COM

একইভাবে আমার মাথায় আরেকটি প্রশ্ন, আমরা তেত্রিশবার তোপধ্বনি করি কেন? বত্রিশবার কেন করি না, বা চৌত্রিশবার কেন করি না।

এখন বলি এগারো এবং তেত্রিশ এই লেখায় হঠাৎ কেন আনলাম। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে জিতবে এবং আমরা তেত্রিশবার তোপধ্বনি করব। এই ভেবেই তেত্রিশ তোপধ্বনি প্রসঙ্গ। হ্যালো, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা! আমরা কিন্তু তেত্রিশটা কামান নিয়ে বসে আছি!

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৩

ডাংগুলি

AMARBOI.COM

বাংলাদেশের অতি প্রাচীন খেলার একটির নাম 'ডাংগুলি'। আমি ডাংগুলিকে বলি ক্রিকেটের আদি পিতা। কেন বলি তা খেলা ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। ডাংগুলিতে একজন ব্যাটসম্যান লম্বা ডান্ডা (ব্যাট) হাতে মাঝখানে দাঁড়ায়। এর নাম ডাং। তার সঙ্গে থাকে ছয় ইঞ্চি লম্বা কাঠি (বল)। কাঠিটাকে বলে গুলি। ডাং আর গুলির খেলার নাম ডাংগুলি। খেলোয়াড় মাটিতে খানিকটা উঁচু করে রাখা গুলিকে ডাং-এর খোঁচায় শূন্যে তুলে সজোরে বাড়ি দিয়ে দূরে পাঠায়। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডাররা চেষ্টা করে কাঠিটা লুফে নিতে অর্থাৎ ক্যাচ ধরতে। ক্যাচ ধরকে পারলেই ব্যাটসম্যান আউট। ক্রিকেটের সঙ্গে ডাংগুলির অমিল হলো, এখানে কোনো বোলার নেই। যে ব্যাট করে সে-ই বোলার। স্ট্যাম্প আউট বলে কিছু নেই, ক্যাচ আউটই একমাত্র আউট। ভারতবর্ষের ডাংগুলি খেলা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশরা ক্রিকেট খেলা শুরু করল—এমন মনে হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

শৈশবের কথা। দাদার বাড়িতে বেড়াতে গেছি, জুটে পড়েছি ডাংগুলি খেলার দলে। মহা উৎসাহে খেলা চলছে। আমাকে খেলতে দেখে দাদাজানের (মৌলানা আজিমউদ্দিন আহমেদ, মাদ্রাসাশিক্ষক) মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, যাবতীয় খেলার পেছনে থাকে ইবলিশ

শয়তানের উৎসাহ এবং ইন্ধন। একে বলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা। খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়েরা অন্য কাজ ভুলে যায়, নামাজের ওয়াক্ত ভুলে যায়, শয়তান এই জিনিসই চায়। কাজেই তোমাকে আর যেন কোনো খেলাধুলায় না দেখি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

দাদাজান বললেন, যে খেলে সে যেমন শয়তানের প্রভাবে থাকে, যে দেখে সেও থাকে। খেলা দেখবেও না।

আমি আবারও হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম।

দাদাজানের কথায় মনে হতে পারে, ইসলাম ধর্মে খেলাধুলা নিষিদ্ধ। তা মোটেও না। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. ইউসুফ আল কারদাভি ফতোয়া দিয়েছেন, বাজি নেই এমন সব শারীরিক এবং মানসিক খেলা ইসলাম ধর্মে বৈধ।

আমাদের নবীজি (সা.) নিজেও হজরত আয়েশা (রা.)-র সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

শয়তানের প্রভাবেই হয়তো আমাদের খেলোয়াড়েরা যখন চার-ছয় মারে, আমি চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলি। ক্রিকেট বিষয়ে আমার প্রবল উত্তেজনা দেখে একজন পত্রিকার রিপোর্টার আমার ইন্টারভিউ নিতে এলেন এবং ক্রিকেট বিষয়ে নানা প্রশ্ন করলেন। আমি কোনোটারই জবাব দিতে পারলাম না। গুগলি কী বস্তু, বলতে পারলাম না। রিভার্স সুইং কী, তাও জানি না। ক্রিকেট বিষয়ে আমার মূর্খতায় সাংবাদিক হতাশ হলেন, একপর্যায়ে বললেন, আপনি যে ক্রিকেট কিছুই বোঝেন না। এটা কি লিখতে পারি?

আমি বললাম, অবশ্যই লিখতে পারো।

সাংবাদিক বললেন, কিছু না বুঝেও ক্রিকেট কেন পছন্দ করেন, তা কি ব্যাখ্যা করবেন?

আমি বললাম, ক্রিকেট পছন্দ করি, কারণ আমি একজন গল্পকার, ফিকশন রাইটার।

স্যার, বুঝিয়ে বলুন।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ক্রিকেটে এক ওভারে ছয়টি করে বল করা হয়। বল করা মাত্র গল্প শুরু হয়। নানান সম্ভাবনার গল্প। ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার সম্ভাবনা, ছক্কা মারার সম্ভাবনা, শূন্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ছয়টা বল হলো ছয়টি সম্ভাবনা গল্পের সংকলন। এখন বুঝেছ?

সাংবাদিক হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। আমি বললাম, সারা পৃথিবীতে কবিদের একটা বড় অংশ ক্রিকেট পছন্দ করেন। কেন করেন, জানো? কবিদের

AMARBOI.COM

কাজ হচ্ছে ছন্দ নিয়ে। ক্রিকেট ছন্দোময় খেলা বলেই কবিদের পছন্দের খেলা।

ক্রিকেটপাগল কবি নির্মলেন্দু গুণের ক্রিকেট আবহে লেখা একটি কবিতা পড়লে কেমন হয়?

শব্দের স্পিনার

গ্যারি সোবার্স, চন্দ্র-প্রসন্ন-বেদী ও আবদুল কাদিরের মতোন
আমি শব্দকে স্পিন করি। তাদের কাছেই আমি শিখিয়াছি এই
ঘূর্ণিবলের জাদু। আপেলের মতো লাল বলটিকে ট্রাউজারে ঘষে
ঘষে, তাতে কপালের ঘাম মাখিয়ে আবদুল কাদির যে রকম
নৃত্যের ভঙ্গিতে এসে স্ট্যাম্প লক্ষ্য করে তার বলটিকে ছোঁড়ে,
আমিও তেমন প্রতিটি শব্দের কানে মন্ত্র পাঠ করি, তারপর
'যাও পাখি' বলে তারে ভালোবেসে তোমার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেই।

আদি ক্রিকেটে মুখভর্তি দাড়ির একটা ব্যাপার ছিল। হাস্যকর লাগছে? কথা সত্যি! ক্রিকেট খেলার যেকোনো প্রাচীন ছবিতে দেখা যাবে মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে ব্রিটিশ লর্ডরা ক্রিকেট খেলছেন। বঙ্গদেশে ক্রিকেটের সূচনা করেন সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তাঁর ভাই এবং বন্ধুরা। কাকতালীয় হলেও সত্যি, তাঁদেরও মুখভর্তি দাড়ি ছিল।

দাড়ি ট্র্যাডিশন কিছুটা হলেও আমাদের ক্রিকেট টিমেও আছে। আমাদের একজন ক্রিকেটারের মুখ ভর্তি দাড়ি (সোহরাওয়ার্দী শুভ)।

আজ আয়ারল্যান্ডকে বাংলাধোলাই দেওয়া হবে। আসুন, সেই প্রস্তুতি নিই। আমরা তো খেলব না, গলা ফাটিয়ে চেঁচাব। গার্গল করে গলা পরিষ্কার করা দরকার না?

রয়েল বেঙ্গল টাইগার খানিকটা ঝিমুনির মধ্যে আছে। তাকে জাগাতে হবে। তার বিকট হালুমধ্বনি শোনার অপেক্ষা।

পাদটীকা

পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ গ্রামের এক ঈদগাঁ মাঠে। গ্রামের নাম মশুয়া। ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং তাঁর ভাইয়েরা।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১

AMARBOI.COM

৪

মাঠরঙ্গ

গুপ্তধন পাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটেছে। আমার হাতে বিশ্বকাপের দুটো টিকিট। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের খেলা মাঠে বসে দেখতে পারব। টিকিট দুটি এমপি হিসেবে শাওনের মা পেয়েছেন। তাঁর হাত থেকে ছিনতাই করে নিয়ে নিয়েছে তাঁর ছোট দুই মেয়ে। শাওন দুই বোনের হাত থেকে গোপনে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। চোরের ওপর বাটপারি একেই বলে।

আড়াইটার সময় খেলা শুরু হবে, আমরা সাড়ে ১২টার সময় ঘর থেকে বের হলাম। স্টেডিয়ামে ঢুকতে হলে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে, নিরাপত্তা চেকিং, আগেভাগে যাওয়াই ভালো।

স্টেডিয়ামে ঢোকার পথের রাস্তায় কোনো যানবাহন চলছে না। শত শত মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে। এদের হাতে টিকিট নেই। যেখানে খেলা হবে, তার আশপাশেই থাকতে পারার আনন্দেই তারা অভিভূত।

রাস্তায় প্রচুর তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল রংতুলি নিয়ে ঘুরছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে বাংলাদেশ পতাকা আঁকছে। অতি উৎসাহীরা তাদের সারা মুখে হলুদ-কালো আঁকিবুঁকিতে বাঘ সাজছে। শাওন তার গালে বাংলাদেশের পতাকা আঁকাল। আমি তাকে বললাম, আমার বাঘ সাজার শখ! তোমার কি আপত্তি আছে?

শাওন বলল, আপত্তি থাকবে কেন? তোমার যা সাজার ইচ্ছা সাজো।

শেষ মুহূর্তে বাঘ সাজার পরিকল্পনা বাদ দিলাম। বৃদ্ধ বাঘ সেজে মাঠে ঢোকার মানে হয় না। মাঠে ঢুকবে তরুণ বাঘ এবং বাঘিনীরা।

প্রথম পর্যায়ের নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে আমি ধরা খেলাম। পকেটের সিগারেটের প্যাকেট-ম্যাচ ফেলে দিতে হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিরাপত্তা চেকিংয়ে শাওন ধরা খেল। তার হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেল ফেস পাউডারের কৌটা, মেকআপের কিছু জিনিসপত্র ও চিরুনি। সব ফেলে দিতে হবে। শাওন করুণমুখে দেনদরবার করছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। দেনদরবারে লাভ হলো না। সব ফেলে দিতে হলো।

স্টেডিয়ামে ঢুকে ধাক্কার মতো খেলাম। সব ছবির মতো সুন্দর। আমি বিদেশি কোনো স্টেডিয়াম দেখিনি, কাজেই তুলনা করতে পারছি না। তুলনা

AMARBOI.COM

ছাড়াই বলছি, আমাদের এই স্টেডিয়াম দৃষ্টিনন্দন। বড় কোনো হোটেলের ঘরে ঢুকলে প্রথমেই বাথরুম দেখতে ইচ্ছা করে। আমি স্টেডিয়ামের বাথরুমে উঁকি দিলাম, সব ঝকঝক তকতক করছে।

টিকিটে নম্বর দেওয়া ছিল। নম্বর মিলিয়ে বসেছি। আমাদের সামনে (মাঠের ওপাশে) বিশাল টিভি স্ক্রিন। আমি অস্বস্তি নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। অস্বস্তির কারণ পুরো মাঠ একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আমার অভ্যাস টিভি স্ক্রিনে খেলা দেখা। সেখানে সবকিছুই খণ্ড খণ্ড করে দেখানো হয়। যখন বোলার বল হাতে ছুটে আসেন, তখন শুধু বোলারকে ধরা হয়। বল দেখানো হয় স্লো মোশনে। এখন সব খেলোয়াড়কে একসঙ্গে দেখব, ব্রেইন ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে পারছে না।

টস হয়ে গেছে। বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে। সারা মাঠে আনন্দের ঢেউ (আক্ষরিক অর্থেই ঢেউ), এক প্রান্ত থেকে ঢেউ শুরু হয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে থামে। এর নাম মেক্সিকান ওয়েভ।

দুই দলের খেলোয়াড়েরা সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। সবার সামনে বাংলাদেশের একটি করে বালক বা বালিকা। সুন্দর দৃশ্য। শুরু হলো আয়ারল্যান্ডের জাতীয় সংগীত দিয়ে। অনেক দর্শক দেখলাম উঠে দাঁড়ালেন। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আয়ারল্যান্ড আজ আমাদের শত্রু। শত্রুদের জাতীয় সংগীতে কি উঠে দাঁড়ানো উচিত?

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সময় অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। দর্শকেরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। গানের সঙ্গে গলা মিলাচ্ছেন। আমি লক্ষ করলাম, আমার চোখে পানি এসে গেছে।

খেলা শুরু হয়েছে। তামিমের দুর্দান্ত ঝোড়ো ব্যাটিং। আমাদের পেছনে বসা কিছু তরুণের মন্তব্য শুনে মজা পাচ্ছি।

'তামিম তক্তা বানায়ে দাও।'

'মুখ বরাবর বল মারো। বদগুলোর মুখ ভোঁতা করে দাও। কত বড় সাহস! বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে আসে।'

'তামিমের আজ যে অবস্থা সাড়ে তিন শ থেকে চার শ রান উঠবে। আয়ারল্যান্ড আজ মাঠেই হাগামুতা করবে।'

আমি এদের উত্তেজনায় যুক্ত হতে পারছি না, কারণ বল চোখে দেখছি না। বল কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, টিভি পর্দায় খেলা দেখা উচিত ছিল। মাঠে এসে ভুল করেছি।

আমার সামনের সারিতে এক তরুণ ও তরুণীও আমাকে খেলায় মন দিতে

AMARBOI.COM

দিচ্ছে না। তারা হয় নতুন বিয়ে করেছে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা সারাক্ষণই একে অন্যের ছবি তুলছে। একজন অন্যজনের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পায়ের খেলাও খেলছে। পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি। ভুভুজেলা নামক বাদ্যযন্ত্রটি এই স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই যুগল ভুভুজেলার একটি মিনি সংস্করণ জোগাড় করেছে। বস্তুটি বাঁশির মতো না, চারকোনা, ফুঁ দিলেই ভুভুজেলার চেয়েও বিকট শব্দ হয়। এরা ক্ষণে ক্ষণে ভুভুজেলা বাজিয়ে আমাকে চমকাচ্ছে।

আমার পাশে এক ভদ্রলোক বসেছেন। তিনি সারাক্ষণই উচ্চ স্বরে মোবাইল ফোনে বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। খেলা কী হচ্ছে বা না হচ্ছে এদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই।

কে সামছু! আমি তো মাঠে খেলা দেখছি। ফজলু কই? তারে টেলিফোনে পাচ্ছি না। ফজলুকে বল, আমারে যেন কল দেয়। রংমিস্ত্রি পেয়েছ? আচ্ছা আমি পাত্তা লাগাচ্ছি।

খেলা এগোচ্ছে মোবাইলওয়ালা রংমিস্ত্রির অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন।

খাদক প্রজাতির একজনকে দেখলাম, খেলা শুরু থেকেই তিনি খাবার স্টল থেকে একের পর এক খাবার নিয়ে আসছেন। শেষ হচ্ছে, আবার আনছেন। খাদ্য গ্রহণ চলছেই। আবহসংগীতের মতো মুরগির হাড় চিবানোর শব্দ আসছে।

পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্যকে দেখে খুব মায়া লাগল। তাদের ডিউটি পড়েছে বক্সের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকার। চমৎকার খেলা হচ্ছে, বেচারারা উপস্থিত থেকেও খেলা দেখতে পারছে না, তাদের তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে উল্লসিত দর্শকদের মুখের দিকে। উল্লাসের কারণ জানার অধিকার তাদের নেই।

উল্লাসে বাধা পড়ল, ইমরুল কায়েস আউট। বাংলাদেশের টিমে ডমিনো এফেক্ট প্রবল। একা কেউ আউট হয় না, দলবল নিয়ে হয়। দেখতে দেখতে চার ব্যাটসম্যান শেষ। সাবিকের আউটে মাঠে নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা।

শেষ ভরসা আশরাফুল। সাত নম্বরে নেমে সে সবাইকে চমকাবে—এই আমাদের বিশ্বাস। মাঠে আশরাফুল ঢোকামাত্র, আমরা হাততালি দিলাম। আমাদের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে এল। হায় খোদা! এ তো দেখি পুরোনো আশরাফুল। এক রান করে আউট। ব্যাট নিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে হাসিমুখে মাঠ থেকে বিদায়।

আমার পেছনে বসা তরুণের দল বলল, আশরাফুলকে এমন শাস্তি দেওয়া

AMARBOI.COM

দরকার, যেন তার সারা জীবন মনে থাকে। একটা লম্বা বাঁশ এনে...। বাক্যটি লিখলাম না। পাঠকদের কল্পনায় ছেড়ে দিলাম।

আশরাফুল আউট হওয়ার পরপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। শাওনকে বললাম, বাংলাদেশের পরাজয় আমি এত মানুষের সঙ্গে দেখব না। আমি চললাম।

শাওনও উঠে দাঁড়াল। দুঃখিত গলায় বলল, মাঠে বসে বাংলাদেশের বিজয় দেখবে বলে তোমাকে মাঠে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থা হবে কে জানত! সরি।

বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়ের খবর রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের হতাশায় ম্রিয়মাণ মুখ দেখে দেখে ফিরছি। আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শাওন বলল, প্লিজ, এত মন খারাপ করবে না। পরের ম্যাচে আমরা অবশ্যই জিতব। এত মানুষের ভালোবাসা কখনো বৃথা যেতে পারে না।

পাদটীকা

একি কাণ্ড! এই খেলায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতেছে। অভিমান করে মাঠ ছেড়ে চলে আসায় আসল খেলাটা দেখা হলো না। আফসোস, আফসোস এবং আফসোস!

০৪ মার্চ ২০১১

AMARBOI.COM

১

হাসন রাজা
বাউলা কে বানাইল রে?

হাসন রাজার বিখ্যাত গান 'লোকে বলে বলে রে ঘরবাড়ি ভালা না আমার' শুনলে কারও কারও তাঁর ঘরবাড়ি দেখার ইচ্ছা হতে পারে। এমন কিছু মানুষ গেলেন হাসন রাজার ঘরবাড়ি দেখতে। হাসন রাজা নিজেই আগ্রহী হয়ে তাঁদের ঘরবাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন। নিজের কবরের জায়গা দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন আমার বাড়ি।

ঘটনা কতটুকু সত্যি জানি না। প্রভাতকুমার শর্মার লেখা *মরমী কবি হাসন রাজায়* এ রকম পড়েছি। সুনামগঞ্জে গিয়ে সেই বিখ্যাত 'ঘর' দেখেও এসেছি। একই সঙ্গে তাঁর তরবারি, কাঠের বউলাওয়ালা খড়ম এবং আচকানও দেখলাম। সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন হাসন রাজার প্রপৌত্র কবি দেওয়ান মমিনুল মউজদিন। আমার ছেলেমানুষি আগ্রহ দেখেই হয়তো তিনি বললেন, স্যার, হাসন রাজা সাহেবের আচকানটা কি একটু পরে দেখবেন? আমি আচকান পরে ওনার খড়ম পায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ গম্ভীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম, শুধু তলোয়ারটা হাতে নিলাম না।

হাসন রাজার প্রতি আমার প্রবল আগ্রহের শুরুটা করে তেরো-চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী। আমি গিয়েছি হবিগঞ্জের কী একটা অনুষ্ঠানে। শেষ রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ঘুমুতে গেছি। ঠিক করে রেখেছি, দুপুর পর্যন্ত ঘুমুব। ভোর ছয়টায় এই মেয়েটা এসে ঘুম ভাঙাল। সে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমাকে গান শোনাবে। কাঁচা ঘুম ভাঙানোর জন্য তাকে ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারলাম না। মেয়েটার চোখ করুণ, চেহারায় গাঢ় বিষণ্ণতা। আমি বললাম, শোনাও তোমার গান। একটা

শোনাবে, এর বেশি না।

সে গাইল, 'নিশা লাগিলো রে বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিলো রে।' কী সুন্দর বাণী! কী সরল সুর। আমি বললাম, এই গানটা কার লেখা?

হাসন রাজার।

উনার আর কোনো গান তুমি জানো? জানলে গাও।

আর জানি না।

আমি ঢাকায় ফিরলাম। *অচিনবৃক্ষ* নাটকে গানটি ব্যবহার করলাম।

তারপর ডেকে পাঠালাম সেলিম চৌধুরীকে। সে মহসিন হলের ছাত্র। আমি তার হলের হাউস টিউটর। সেলিমকে বললাম, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে হাসন রাজার গান সংগ্রহ করে আমাকে শোনানো।

সপ্তাহে দুদিন আমার বাসায় গানের আসর বসে। সেলিম চৌধুরী হাসন রাজার গান গায়। সে তখনো বিখ্যাত হয়নি। তাকে ডাকলেই পাওয়া যায়। প্রতি জোছনায় নুহা শপল্লীতে জোছনা উৎসব করি। সেখানেও হাসন রাজার একটি বিশেষ গান দিয়ে জোছনা উৎসবের শুরু হয়। গানটি হলো, 'বাউলা কে বানাইলো রে?' জোছনা উৎসবের শেষ হয় একটি মৃত্যুসংগীত দিয়ে। 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়'। মৃত্যুসংগীতের রচয়িতা সিলেটের মরমি কবি গিয়াস উদ্দিন।

একদিন হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় হাসন রাজার গানের সিডি বের করার সিদ্ধান্ত নিই। তাঁর চমৎকার সব গান একেবারেই গীত হয় না। আমাদের বের করা সিডির কারণে গানগুলো সবাই শুনবে, এ রকম আশা। সেই গান রেকর্ড করা, সিডি বের করা মানেই প্রচুর অর্থ ব্যয়। আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন আমার দুই বন্ধু—প্রকাশক আলমগীর রহমান, আর্কিটেক্ট ফজলুল করিম। সেলিম চৌধুরীর গলায় গান রেকর্ড করা হলো। সিডি করা হলো ইংল্যান্ডে। দুঃখের ব্যাপার, সিডি খুব কম মানুষই কিনল। আমার তখন রোখ চেপে গেছে দেশের মানুষকে হাসন রাজার গান শুনতেই হবে। হাসির ধারাবাহিক নাটক লিখলাম, নাম *আজ রবিবার*। প্রতিটি পর্ব শেষ হলো হাসন রাজার বিভিন্ন গান দিয়ে। যেদিন এই নাটক প্রচার শেষ হলো, আমার কাছে মনে হলো, এই দরদি মরমি কবির প্রতি আমার যে ঋণ, তা খানিকটা শোধ হয়েছে।

আমি হাসন রাজার জীবনী লিখতে বসিনি। তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গল্প বলতে বসেছি। এই অতি বিচিত্র মানুষের একটি ঘটনা কোনো জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যাবে না, সেটি বলা যেতে পারে।

AMARBOI.COM

লখ্‌নৌর এক বাইজির রূপ এবং গানের কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে সুনামগঞ্জ নিয়ে আসেন। এরপর তিনি এই বাইজিকে মুগ্ধ করার জন্য গান লিখতে শুরু করেন হিন্দিতে।

'পিয়ারিরে বালা ম্যাঁয় তো উদাস হুঁ...'

নুহাশ চলচ্চিত্রের বানানো 'জলসাঘর' অনুষ্ঠানে আমরা হাসন রাজার লেখা এই হিন্দি গান ব্যবহার করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Religion of Man' নামে যে বক্তৃতা দেন, তাতে হাসন রাজার গানের দর্শন ব্যাখ্যা করেন।

> It is a village poet of East Bengal who in his song preaches the philosophical doctrine that the universe has its reality in its relation to the person. He sings,
> The sky and the earth are born of my own eyes;
> The hardness and softness, the cold and the heat
> Are the product of my own body;
> The sweet smell and the bad are of my own nose.

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ থাক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে হাসন রাজাকে নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর একটা কবিতা আছে, এটা কি পাঠকেরা জানেন? কবিতার নাম 'হাসন রাজার বাড়ি'। কবিতার কয়েকটা লাইন তুলে এই রচনা শেষ করছি—

> এখানে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রব আমি আর হাসন রাজা
> কও তো হাসন রাজা কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি?
> শিওরে সমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা
> চৌখুপ্পি বাগানে এক বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
> দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা।

পাদটীকা ১

হাসন রাজার একটি গানের প্রথম তিনটি চরণ—

> হাসন রাজায় কয়
> নামাজ রোজা ছাইড়া দিচ্ছি
> ভেস্তে যাইবার ভয়।

বেহেশতে যেতে তাঁর ভয়টা কোথায় তা তিনি গানে ব্যাখ্যা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক গানটি সংগ্রহ করুন।

AMARBOI.COM

পাদটিকা ২

যেসব পাঠক হাসন রাজাকে ভালোভাবে জানতে চান, তাঁদের জন্য গ্রন্থপঞ্জি—

১. *মরমী কবি হাসন রাজা,* আবু সাঈদ জুবেরী (দি ইউনিভার্সেল একাডেমী)
২. *প্রসঙ্গ হাসন রাজা,* ড. আবুল আহসান চৌধুরী (বাংলা একাডেমী)
৩. *মরমী কবি হাসন রাজা,* মতিন রায়হান (হাতেখড়ি)
৪. *হাসন রাজা শব্দ নৈঃশব্দ,* নৃপেন্দ্রলাল দাশ (অনুপম প্রকাশনী)
৫. *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী,* ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী (মেরিট ফেয়ার প্রকাশন)
৬. *হাসন রাজা সমগ্র,* দেওয়ান মোহম্মদ তাছাওয়ার রাজা (পাঠক সমাবেশ)

১৪ এপ্রিল ২০১১

AMARBOI.COM

২

রবীন্দ্রনাথ

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে—এক

আমার মায়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলে বিএ পাস, পড়াশোনা নিয়ে থাকে। আমার নানাজান ঠিক করলেন, মেয়েকে বিদ্বান ছেলের উপযুক্ত করতে হলে তাকেও কিছু বইপত্র পড়তে হবে। আউট বুক (অর্থাৎ নাটক-নভেল) পড়া সেই সময় নিষিদ্ধ ছিল; তার পরও নানাজান কলকাতা থেকে মেয়ের জন্য একটা উপন্যাস কিনে নিয়ে এলেন। নাম *নৌকাডুবি*। লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মায়ের পড়া জীবনের প্রথম উপন্যাস। তাঁকে প্রথম ছুটির নিমন্ত্রণে ডেকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা রবীন্দ্রনাথ দিয়ে তাঁর আউট বই পড়া শুরু করেন জেনে বাবা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

আমি নিজেও বিস্মিত হই, কারণ আমার নিজের শুরুটা হয় 'স্বপন কুমার' সিরিজ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আমার শৈশবের বিভীষিকার নাম। কারণটা বলি, বাবা ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করার মহান দায়িত্ব হাতে নিলেন। আমাদের তিন ভাইবোনকে ডেকে হাতে *সঞ্চয়িতা* ধরিয়ে

দিলেন—সবাইকে একটা করে কবিতা মুখস্থ করতে হবে। ছোট বোন শেফুর ভাগে পড়ল 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। জাফর ইকবাল পেল 'প্রশ্ন'। আমার কপালে পড়ল 'এবার ফেরাও মোরে'। এক শ সাতাশ লাইনের বিশাল কবিতা। এই কবিতাটি বাবার বিএ ক্লাসে পাঠ্য ছিল। তিনি মুখস্থ বলতে পারেন। তিনি চাচ্ছেন, তাঁর বড় ছেলেও পারবে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এত বড় কবিতা কিছুতেই মুখস্থ হয় না। কিছু দূর এগোতেই সব জট পাকিয়ে যায়। এদিকে আমার ছোট দুই ভাইবোন কবিতা মুখস্থ বলে বাবার কাছ থেকে পুরস্কার হাতিয়ে নিয়েছে (এক আনা করে পেয়েছে)। সমস্যা হচ্ছে, ওদের কবিতা দুটি শুনে শুনে আমিও মুখস্থ করে ফেলেছি। তাতে লাভ হচ্ছে না। বাবার কাছে পরীক্ষা দিতে যাই, কিছু দূর বলেই খাবি খাই। বাবা হতাশ চোখে তাকান। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি বালকের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা।

সত্যিকার অর্থে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পড়ি আমি যখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। থাকি বান্দরবান। বাবা সেখানকার পুলিশ লাইব্রেরির জন্য বই কিনেছেন। বইগুলোর একটি হলো *সঞ্চয়িতা*, আরেকটি *গল্পগুচ্ছ*। আমি *গল্পগুচ্ছ* কবজা করে ফেললাম। পাঠ্যবইয়ের বদলে এই বই পড়ি। বাবা দেখেও না দেখার ভান করেন। আহা, কী আনন্দ! আমার পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পের নাম 'নিশীথে'। একটি ভূতের গল্প, অথচ কোথাও ভূত নেই। আমি এখনো অবাক হয়ে ভাবি, ভূত ছাড়া ভূতের গল্প লেখার মতো ক্ষমতা আর কতজনের আছে!

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে কত না উৎসব! এমনকি পত্রিকার পাতায় রবীন্দ্র-ফ্যাশনও ছাপা হচ্ছে। তরুণ-তরুণী মডেলরা রাবীন্দ্রিক সময়ের পোশাক পরে ফটোসেশন করছেন। বিউটিশিয়ানরা টিপস দিচ্ছেন সেই সময়ের মেয়েদের সাজ বিষয়ে: 'লম্বা হাতার ব্লাউজ পরতে হবে', 'চোখে আইশ্যাডো দেওয়া যাবে, তবে কপালে টিপ পরতে হবে।'

আমার বাবা এই সময়ে বেঁচে থাকলে কী করতেন? আমার ধারণা, আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্র-ফ্যাশনের মডেল হতেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নতুন কথা আমি আপনাদের জানাতে পারছি না। সব কথা নানানভাবে নানান ভঙ্গিমায় বলা হয়েছে। কম জানা একটি তথ্য অবশ্য দিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ যে ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা ভাষাশিক্ষার বই লিখেছেন, এই তথ্যটি কি জানা আছে? যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্য যুক্তাক্ষর দিয়ে

AMARBOI.COM

কবিতা লিখেছেন। 'ঞ্জ'র মতো জটিল যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্য লেখা তাঁর একটি কবিতা :

অঞ্জনা নদীতীরে খঞ্জনি গাঁয়ে
পুরো মন্দিরখানি গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ দেয়ালখানি এক কোণে তারই
অন্ধ নিয়াছে বাসা কুঞ্জবিহারী
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর
আছে এক লেজকাটা ভক্ত কুকুর
আর আছে একতারা বক্ষেতে ধরে
গুনগুন গান গায় গুঞ্জন স্বরে
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান
হরি হরি রব উঠে অঙ্গন মাঝে
ঝনঝনি ঝনঝনি খঞ্জনি বাজে
ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান ॥

কবিতাটি আরও দীর্ঘ। আরও অনেক 'ঞ্জ'র কারবার। রবীন্দ্রনাথ এই যুক্তাক্ষর শিখিয়ে ছাড়বেন।

পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমার ও শাওনের মধ্যে কিছু তিক্ততা আছে। শাওনের খুব শখ, সে একটি রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করবে, সেই নাটকটি যেন রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে আমি করে দিই। তার পছন্দ 'একটি মুসলমানি গল্প'। আমি বলেছি, রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে নাটক আমি কোনো দিনই করব না। কারণ একটাই, কোথাও ভুল করে ফেলব। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভুল করা যায় না।

আমরা কত না ভাগ্যবান, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি হিসেবে জন্মেছেন। আমরা বড় হয়েছি রবীন্দ্রবলয়ে।

হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।

৮ মে ২০১১

AMARBOI.COM

৩

রবীন্দ্রনাথ

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে—দুই

ভারতের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে দুটি কার্টুন করেছিলেন। একটিতে দেখা যাচ্ছে হাওয়াই শার্টের দোকান। পেছনে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছবির নিচে লেখা, 'আমাদের হাফ হাওয়াই শার্ট রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।' দ্বিতীয় কার্টুনটিতে খালি গায়ে নেংটিপরা এক লোক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি তখন শান্তিনিকেতনের মাঠে গরু চড়াতাম। একদিন কবিগুরু ডেকে বললেন...'

সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশ মনে হয় কার্টুনের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেকগুলো পত্রিকা রবীন্দ্র-ফ্যাশন পাতা বের করেছে। একজন মডেলের ছবি দেখে ভালো লাগল। তিনি বুক-খোলা পাঞ্জাবি পরেছেন। তার বক্ষের কালো লোম পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

ফ্যাশন ডিজাইনাররাও রবীন্দ্র-ফ্যাশনের টিপস দিয়ে লেখা লিখছেন। একটি লেখায় পড়লাম, নামী এক বিউটিশিয়ান মেয়েদের উদ্দেশে বলছেন, চোখে আইশ্যাডো দেওয়া যাবে, তবে কপালে টিপ থাকতে হবে। কিছু মডেলকন্যা রবীন্দ্র-ফ্যাশনে শাড়ি-ব্লাউজ পরে ফটোসেশন করেছেন। তাদের ব্লাউজের হাতা কনুই পর্যন্ত, তবে পেছনের কাট...থাক এসব কথা, কে জানে কবিগুরু হয়তো মেয়েদের পিঠখোলা ব্লাউজ পছন্দ করতেন।

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনবার বিভীষিকার মতো এসেছিলেন। এই তিনবেলার গল্প করা যেতে পারে। শৈশবের কথা। বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে তিনটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বের করে দিয়ে বললেন, কবিতা মুখস্থ করতে হবে। আমার ভাগে পড়ল বিশাল কবিতা—'এবার ফেরাও মোরে'। ১২৭ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। কিছুতেই মুখস্থ হয় না। বাবা কিছুদিন পর পর পরীক্ষা নেন। আমি আটকে গেলেই কঠিন চোখে তাকান। আমার বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। হায় রে রবীন্দ্রনাথ!

দ্বিতীয়বারের কথা বলি। এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রীয়ভাবে শিলাইদহে রবীন্দ্র-উৎসব করবেন। আমার মতো অভাজন সেখানে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে

একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পেলাম। কারণ, সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ লেখকেরা এরশাদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যেতে রাজি ছিলেন না। ছোটগল্পের অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।

যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন ভোরবেলায় আমাকে জানানো হলো, সৈয়দ আলী আহসান সভাপতিত্ব করলে বিতর্কের সম্ভাবনা দেখা দেবে মনে করা হচ্ছে। উনি শিলাইদহে আসা বাতিল করেছেন। আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এক আকাশ না, সপ্ত আকাশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী থেকে জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকেরা এসেছেন। তাঁরা প্রবন্ধ পড়বেন। সেই আসরে আমি সভাপতি! অনেক দেনদরবার করেও রক্ষা পেলাম না। মনে মনে কয়েকবার 'হায় রে রবীন্দ্রনাথ' বলে সভাপতির আসনে বসলাম। বুক ধকধক করছে, কান দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। কে কী বলছে, কিছুই কানে ঢুকছে না। শুধু লক্ষ করছি, পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকশ্রেণী মঞ্চে উঠেই অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা শুরু করেছেন। এই প্রথম কোনো অনুষ্ঠানের সভাপতি হওয়া। এই শেষ। আমি বাকি জীবনে সভাপতি হইনি। আবার যে হব, সেই সম্ভাবনা শূন্যেরও নিচে।

তৃতীয় বিভীষিকার কথা বলি। বগুড়া ইয়ুথ ক্যয়ারকে দিয়ে আমি একটি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করালাম। যিনি গান করলেন তাঁর নাম টিপু। বিখ্যাত গান, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' সুর অবিকৃত রেখে গানটি করা হলো বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষায়। আমার যুক্তি হলো, রবীন্দ্রনাথের গান যদি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গীত হতে পারে, তাহলে আঞ্চলিক ভাষায় কেন গীত হতে পারবে না!

গান প্রচারের আগেই ঘটনা রবীন্দ্রপ্রেমীদের কাছে চলে গেল। কেউ কেউ গানের কপিও পেয়ে গেলেন। তাঁরা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। বাংলাদেশ টিভির প্রযোজক মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের ঘরে এক রবীন্দ্রভক্ত (বিখ্যাত ব্যক্তি বলেই নাম গোপন করছি) কঠিন গলায় বললেন, যে দেশে রবীন্দ্রনাথের চর্চা হয়, সে দেশে আপনার মতো মানুষের থাকা উচিত না।

তার পরও এই দেশে আনন্দের সঙ্গে বাস করছি, কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকেছেন ছুটির নিমন্ত্রণে। আমার ছুটি আমার আনন্দের সবটা জুড়েই রবীন্দ্রনাথ। আমি কতই না ভাগ্যবান!

আগস্ট ২০১২, ঈদ ম্যাগাজিন

AMARBOI.COM

৪

জাহানারা ইমাম

তিনি

রাত নয়টার মতো বাজে। আমি কী যেন লিখছি। হঠাৎ আমার মেজো মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'বাবা, খুব বিখ্যাত মানুষ তোমাকে টেলিফোন করেছেন।'

আমি দেখলাম, আমার মেয়ের মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বিখ্যাত মানুষেরা যে আমাকে একেবারেই টেলিফোন করেন না, তা তো না। মেয়ে এত উত্তেজিত কেন?

'বাবা, তুমি কিন্তু আবার বলতে বলবে না যে তুমি বাসায় নেই। তোমার বিশ্রী অভ্যাস আছে, বাসায় থেকেও বলো বাসায় নেই।'

আমি বললাম, 'টেলিফোন কে করেছে, মা?'

আমার মেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'জাহানারা ইমাম।'

'এই নাম ফিসফিস করে বলছ কেন? ফিসফিস করার কী হলো?'

'বাবা, উনি যখন বললেন তাঁর নাম জাহানারা ইমাম, তখন আমি এতই নার্ভাস হয়ে গেছি যে তাঁকে স্লামালিকুম বলতে ভুলে গেছি।'

'বিরাট ভুল হয়েছে। যা-ই হোক, দেখা যাক কী করা যায়।'

আমি টেলিফোন ধরলাম এবং বললাম, 'আমার মেয়ে আপনাকে সালাম দিতে ভুলে গেছে, এ জন্য সে খুব লজ্জিত। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ওপাশ থেকে তাঁর হাসির শব্দ শুনলাম। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে টেলিফোন করেছি কিছু কঠিন কথা বলার জন্যে।'

'বলুন।'

'আপনি রাগ করুন বা না করুন, কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে।'

'আমি শঙ্কিত হয়ে আপনার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আপনি স্বাধীনতাবিরোধীদের পত্রিকায় লেখেন কেন? আপনার মতো আরও অনেকেই এ কাজটি করে। কিন্তু আপনি কেন করবেন?'

তিনি কথা বলছেন নিচু গলায়, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কোনো আড়ষ্টতা নেই।

AMARBOI.COM

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আক্রমণ এদিক থেকে আসবে, ভাবিনি। তবে পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু যুক্তি আছে। খুব যে দুর্বল যুক্তি, তা-ও না। যুক্তিগুলো তাঁকে শোনালাম। মনে হলো, এতে তিনি আরও রেগে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, 'আপনার মিসির আলীবিষয়ক রচনা আমি কিছু কিছু পড়েছি, আপনি যুক্তি ভালো দেবেন, তা জানি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে যুক্তি শুনতে চাচ্ছি না। আপনাকে কথা দিতে হবে, ওদের পত্রিকায় লিখে ওদের হাত শক্তিশালী করবেন না। আপনি একজন শহীদ পিতার পুত্র। "তুই রাজাকার" স্লোগান আপনার কলম থেকে বের হয়েছে। বলুন আর লিখবেন না।'

আমি সহজে প্রভাবিত হই না। সে রাতে হলাম। বলতে বাধ্য হলাম, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি আর লিখব না। এখন বলুন, আপনার রাগ কি কমেছে?'

তিনি হেসে ফেললেন। বাচ্চা মেয়েদের একধরনের হাসি আছে—কুটকুট হাসি, বড়দের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে যে-হাসিটা তারা হাসে, সেই হাসি।

আমি বললাম, 'আমি সব সময় লক্ষ করেছি, আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলেন। নিজেকে খুব দূরের মানুষ মনে হয়। দয়া করে আমাকে তুমি করে বলবেন।'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা বলব। এখন থেকে বলব।'

তিনি কিন্তু আমাকে 'তুমি' কখনোই বলেননি। যতবারই মনে করিয়ে দিয়েছি, ততবারই বলেছেন, 'হ্যাঁ, এখন থেকে বলব।' কিন্তু বলার সময় বলেছেন 'আপনি'। হয়তো আমাকে তিনি কখনোই কাছের মানুষ মনে করেননি।

তাঁর অনেক কাছের মানুষ ছিল আমার মা। আমার ছোট ভাই জাফর ইকবাল। জাফর ইকবালের উল্লেখ তাঁর লেখাতে পাই। ব্যক্তিগত আলাপেও জাফর ইকবালের প্রসঙ্গে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি। শুধু আমার ব্যাপারেই একধরনের শীতলতা। হয়তো তাঁর ধারণা হয়েছিল, যে-মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন, আমি সেই আন্দোলন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। যে ১০১ জনকে নিয়ে 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র আদিযাত্রা, আমি সেই ১০১ জনের একজন। অথচ পরে আমার আর কোনো খোঁজ নেই। কাজেই আমার ভূমিকায় অস্পষ্টতা তো আছেই। তিনি আমার প্রতি শীতল ভাব পোষণ করতেই পারেন। সেটাই স্বাভাবিক।

আরেক দিনের কথা, তিনি টেলিফোন করেছেন। গলার স্বর অস্পষ্ট।

AMARBOI.COM

কথা কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনার শরীর কি খারাপ করেছে?'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'শরীর আছে শরীরের মতোই। আপনাকে একটা ব্যাপারে টেলিফোন করেছি।'

'বলুন, কী ব্যাপার।'

'এই যে একটা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমাকে চলতে হচ্ছে মানুষের চাঁদায়। আপনি প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবেন।'

'অবশ্যই দেব।'

'আমি একজনকে পাঠাচ্ছি। এ মাসের চাঁদা দিয়ে দিন।'

'জি আচ্ছা, কত করে দেব?'

'আপনি আপনার সামর্থ্যমতো দেবেন। মাসে দুই হাজার করে দিতে পারবেন?'

'পারব।'

একজন এসে চাঁদা নিয়ে গেল। পরের দুই মাস কেউ চাঁদা নিতে এল না। আমার একটু মন খারাপ হলো। মনে হলো, হয়তো সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হবে না। তৃতীয় মাসে তিনি টেলিফোন করে বললেন, 'কী ব্যাপার, আপনি আপনার চাঁদার টাকা দিচ্ছেন না কেন?'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'কেউ তো নিতে আসেনি।'

'আমার এত লোকজন কোথায় যে পাঠাব! আপনি নিজে এসে দিয়ে যেতে পারেন না? আপনি তো এলিফ্যান্ট রোডেই থাকেন। দুই মিনিটের পথ।'

'আমি আসছি। ভালো কথা, আপনার সঙ্গে রাগারাগি করার মতো একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি এসেই কিন্তু রাগারাগি করব।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এসে নিই, তারপর বুঝবেন।'

'না, এখনই বলুন।'

'আমার বড় মেয়ে নোভার ছিল মাথাভর্তি চুল। আপনি হচ্ছেন তার আদর্শ। আপনার মাথার ছোট ছোট চুল তার খুব পছন্দ। সে আপনার মতো হওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে তার মাথার সব চুল কেটে ফেলেছে।'

'সত্যি?'

'বাসায় আসুন। বাসায় এসে দেখে যান।'

একেবারে কিশোরী গলায় তিনি অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন,

AMARBOI.COM

'আপনার মেয়েকে বলবেন, লম্বা চুল আমার খুব প্রিয়। আমি যখন ওর বয়সী ছিলাম, তখন আমার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। ছবি আছে। আমি আপনার মেয়েকে ছবি দেখাব। চুল কেটে ছোট করতে হয়েছে ক্যানসারের জন্য। কেমোথেরাপির কারণে চুল পড়ে যাচ্ছিল। কী আর করব?'

তিনি একবার আমার বাসায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবেন। তাঁর গল্প করতে ইচ্ছা করছে। গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে আনালাম। বাসায় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। গ্রহ যেমন সূর্যকে ঘিরে রাখে, আমার মেয়েরাও তাঁকে সেভাবে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল। তিনি তাদের বললেন তাঁর শৈশবের কথা। আমি আসরে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'আপনি আসবেন না। এই আসরে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।'

অন্যান্য ফ্ল্যাটে খবর চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা আসছে। তারাও গল্প শুনতে চায়।

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অতি সম্মানিত এই মানুষটিকে সে কী খাওয়াবে? তিনি তো কিছুই খেতে পারেন না।

তিনি আমার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন, শুধু মুখে যাবেন না। কিছু খাবেন। পাকা পেঁপে থাকলে ভালো হয়।

ঘরে পাকা পেঁপে নেই। আমি ছুটলাম পাকা পেঁপের সন্ধানে। লিফট থেকে নামতেই এক ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন, 'জানেন, আমাদের এই ফ্ল্যাটের কোনো এক বাড়িতে জাহানারা ইমাম এসেছেন।'

আনন্দে আমার মন দ্রবীভূত হলো। এই মহীয়সী নারী কত অল্প সময়ে মানুষের হৃদয় দখল করে নিয়েছেন!

তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমাকে দেন আসাদুজ্জামান নূর।

বাসায় তখন ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে। আমার মেয়েরা জন ডেনভারের গান শুনছে 'রকি মাউন্টেন হাই, কলোরাডো'। সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমার মা আমার কাছে জানতে চাইলেন, আন্দোলন এখন কে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমি তাঁকে বললাম, দ্বিতীয় জাহানারা ইমাম আমাদের নেই। জাহানারা ইমাম দুটা-তিনটা করে জন্মায় না। একটাই জন্মায়। তবে কেউ-না-কেউ এগিয়ে আসবেই। অপেক্ষা করুন।

মা জায়নামাজে বসলেন।

আর আমি একা-একা বসে রইলাম বারান্দায়। একধরনের শূন্যতাবোধ

AMARBOI.COM

আমার ভেতর জমা হতে থাকল। কেবলই মনে হতে লাগল, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এই মানুষটির প্রতি আমার ছিল, তা তাঁকে জানানো হয়নি। আমার একটাই সান্ত্বনা, মৃত্যুর ওপাশের জগৎ থেকে আজ তিনি নিশ্চয়ই আমার বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করতে পারছেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি সব সময়ই তাঁর পাশে ছিলাম। যে কদিন বেঁচে থাকব, তা-ই থাকব। বঙ্গজননীর পাশে তাঁর সন্তানেরা থাকবে না, তা কি কখনো হয়?

বাংলার পবিত্র মাটিতে তাঁর পায়ের চিহ্ন আর পড়বে না। স্বাধীনতাবিরোধীদের এই সংবাদে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলার হৃদয়ে তিনি জ্বেলে দিয়েছেন অনির্বাণ শিখা। ঝড়-ঝাপটা যত প্রচণ্ড হোক না কেন, সেই শিখা জ্বলতে থাকবে। কী সৌভাগ্য আমাদের, তিনি জন্মেছিলেন এই দেশে!

১৪ এপ্রিল ২০০১

AMARBOI.COM

৫

আহমদ ছফা

পড়বে না তাঁর পায়ের চিহ্ন

সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দয়াপরবশ হয়ে আমার মাকে বাবর রোডের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ দিয়েছে। আমরা সেই বাড়িতে বাস করি। আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক কিছুই নেই। কম্বলের ওপর শোয়া, কম্বলের ওপর বসা। বাড়িতে পানি নেই, গ্যাস নেই। তাতে কী?

মাথার ওপর একটা ছাদ তো আছে!

আমরা ভাগ্যবান, রাস্তায় বসে নেই। আমাদের সৌভাগ্য স্থায়ী হলো না। এক মধ্যরাতে রক্ষীবাহিনী আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল।

কম্বল এবং হাঁড়ি-পাতিলসহ আমি ভাইবোন, মা, একটা আট বছর বয়সী কাজের ছেলেকে নিয়ে রাস্তায় বসে রইলাম। তিন বোনের মধ্যে দুজন ফিচফিচ করে কাঁদছে। মা কাঁদছেন। আমাদের কাজের ছেলে জিতু মিয়া

কাঁদছে চিৎকার করে। আমি অধিক শোকে পাথর। একসময় রাত কাটবে, সকাল হবে। এদের নিয়ে কোথায় যাব?

জলে ভেসে যাওয়া একটি শহীদ পরিবারকে কে আশ্রয় দেবে?

আমরা সারা রাত পথে বসে রইলাম। সকাল হলো। হঠাৎ দেখি, রিকশা করে ছফা ভাই এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে একটা কেরোসিনের টিন। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। আমাকে বললেন, হুমায়ূন, রিকশায় উঠুন।

আমি বললাম, কোথায় যাব?

ছফা ভাই বললেন, গণভবনে যাব। নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেব। একটি শহীদ পরিবারের প্রতি যে অপমান করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে এই কাজটা করব। আত্মাহুতি।

আমি বললাম, কী বলছেন, ছফা ভাই?

ছফা ভাই বললেন, কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। উঠে আসুন। সঙ্গে ভারী চাদর নিয়ে এসেছি। আপনি আমার গায়ে ভালোমতো চাদরটা জড়িয়ে দেবেন। যেন আগুনটা ঠিকমতো লাগে।

ছফা ভাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছেন, এই খবর চারদিকে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কবি সিকানদার আবু জাফর ব্যস্ত হয়ে ছফা ভাইয়ের কাছে এলেন। ধমক দিয়ে বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি। কথা দিচ্ছি, এই শহীদ পরিবারের জন্যে থাকার একটা ব্যবস্থা করব। তুমি কেরোসিনের টিন আমার বাসায় দিয়ে আসো।

আমি ভাইবোন, মাকে নিয়ে আগের বাড়িতেই ওঠার সুযোগ পেলাম।

AMARBOI.COM

২.

আনিস সাবেতের বোনের বিয়ে হবে কুমিল্লায়। ছফা ভাইকে নিয়ে আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম। রাত আটটার মতো বাজে। আমি, আনিস সাবেত এবং ছফা ভাই গল্প করছি। গল্পের বিষয়বস্তু সাহিত্য। আনিস সাবেত ছফা ভাইয়ের উপন্যাস *সূর্য তুমি সাথীর* কোনো একটি বিষয়ের সমালোচনা করে কী যেন বললেন। ছফা ভাই গেলেন রেগে। কঠিন গলায় বললেন, আনিস, আপনি কথা উইথড্র করুন। উইথড্র না করলে আমি ঢাকা চলে যাব।

আনিস ভাই বললেন, আপনি ইচ্ছা করলেও ঢাকা যেতে পারবেন না। সন্ধ্যা ছ'টার পর কুমিল্লা থেকে ঢাকায় কোনো বাস যায় না।

আপনি কথা উইথড্র করবেন না?

না।

আমি ঢাকায় রওনা হলাম।

ছফা ভাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হাঁটা শুরু করলেন।

আনিস ভাই আমাকে বললেন, হুমায়ূন, তুমি দুশ্চিন্তা করবে না। ছফা ভাই যাবেন কোথায়? বাস নেই, কিচ্ছু নেই। ছফা ভাইয়ের হাতে টাকাও নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন। তখন না হয় আমি কথা উইথড্র করব।

ছফা ভাই কিন্তু ফিরলেন না। সারা রাত হাঁটলেন। পরদিন দুপুরের কিছু পরে হেঁটেই ঢাকায় পৌঁছলেন। তাঁর পা ফুলে গেল। গায়ে জ্বর এসে গেল।

এই ঘটনায় আনিস ভাইয়ের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ছফা ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন। ছফা ভাই বললেন, আমি আপনাকে আগেই ক্ষমা করেছি। আপনাকে আমার কিছু ধন্যবাদও দেওয়া দরকার। সারা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে এসেছি তো, মাথার মধ্যে একটা উপন্যাসের আইডিয়া এসেছে। রাগ করে কুমিল্লা থেকে হেঁটে না এলে এই আইডিয়া আসত না। আনিস, আপনি আমার বিরাট উপকার করেছেন।

আমার যত দূর মনে আছে যে উপন্যাসের গল্প ছফা ভাইয়ের মাথায় এসেছিল তার নাম 'ওঙ্কার'।

৩.

আমি তখন বাংলা একাডেমীর কাউন্সিল মেম্বারদের একজন। ছফা ভাইয়ের মতো ক্ষমতাবান লেখক বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাননি, এটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। আমি চেষ্টা করছি, যেন ছফা ভাই বাংলা একাডেমী পুরস্কারটা পান। তিনি এই খবর জানতে পেরে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠিন গলায় বললেন, আপনার কি ধারণা পুরস্কারের প্রতি আমার কোনো মোহ আছে?

আমি বললাম, না।

তাহলে কেন আমার জন্য নানান জনের কাছে সুপারিশ করে আমাকে ছোট করলেন?

আমি বললাম, আপনাকে ছোট করা কারোর পক্ষেই সম্ভব না।

আমার কোনো ব্যাপারে আপনি কখনোই কারও কাছে সুপারিশ করবেন না।

জি আচ্ছা, করব না।

AMARBOI.COM

আপনি হাত জোড় করে আমার কাছে ক্ষমা চান।

আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলাম। তবে ছফা ভাই যাতে পুরস্কার পান সেই চেষ্টা কিন্তু করে যেতে থাকলাম। কিন্তু পুরস্কার কমিটি ছফা ভাইয়ের নাম হিসেবের মধ্যেও ধরল না।

দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বাংলা একাডেমী কতজনকে পুরস্কার দিয়েছে। কত অগা-মগা-বগা বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক হয়ে গেল। একাডেমীর সভাপতি ছিলেন বিরাট বিরাট মানুষ। কারোরই কখনো মনে হলো না, এ দেশের অসম্ভব শক্তিধর একজন লেখককে তাঁরা বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। ছফা ভাইয়ের মৃত্যুর খবর তাঁরা পেয়েছেন। আমার জানতে ইচ্ছা করে, আজ সামান্য লজ্জা কি তাঁরা পাচ্ছেন? নাকি এইসব মহাজ্ঞানী-গুণীরা লজ্জা নামক মানবিক আবেগের ঊর্ধ্বে বাস করেন?

আমার প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* বই আকারে প্রকাশের সব ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। সাহিত্যের কঠিন মাটিতে আমাকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি দূরে সরে গেছেন। খুঁজে বের করেছেন আমার মতো আরেকজনকে, যার ছফা ভাইয়ের মতো আশ্রয় দরকার।

আমি ছফা ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম। অনেক দিন যোগাযোগ নেই। আনিস সাহেবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছফা ভাইয়ের কাছে ছুটে গেলাম। ছফা ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আনিস কেন চলে গেল? আনিস কেন চলে গেল?

তখন আমার মনে হলো, ছফা ভাইয়ের আগে যদি আমার মৃত্যু হয়। ছফা ভাই নিশ্চয়ই আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আফসোস করবেন। সেই দৃশ্যটা কত-না মধুর হবে।

আমি বেঁচে আছি, ছফা ভাই নেই। আমার আশপাশে এমন কোনো প্রিয়জন নেই, যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলি, 'ছফা ভাই কেন চলে গেলেন?'

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা তাঁর বাসায়। *আগুনের পরশমণি* ছবির প্রিমিয়ার শোতে তাঁকে দাওয়াত দিতে গিয়েছি। ভয়ে ভয়েই গিয়েছি, কারণ অনেকের কাছে শুনেছি, তিনি আমার ওপর খুব রেগে আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকে দেখে তিনি অসম্ভব খুশি হয়ে গেলেন। 'হুমায়ূন এসেছে, হুমায়ূন এসেছে' বলে দারুণ হইচই শুরু করলেন। এই হইচইয়ের এক ফাঁকে গলা নিচু করে বললেন, আপনার যদি টাকাপয়সার খুব প্রয়োজন হয়, আমার কাছে আসবেন। আমি যেখান থেকে পারি জোগাড় করব। টাকার

AMARBOI.COM

জন্যে আজেবাজে লেখা লিখছেন, পড়ে খুব মন খারাপ হচ্ছে।

একসময় হয়তো বা ছফা ভাইয়ের হিসেবে কোনো ভালো লেখা লিখে ফেলব। সেই লেখা ছফা ভাই পড়বেন না। এর চেয়ে কষ্টের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

১০ আগস্ট ২০০১

৬

হারুকি মোরাকামি
নিউ ইয়র্কের আকাশে ঝকঝকে রোদ

AMARBOI.COM

হারুকি মোরাকামি একজন জাপানি লেখক। ১৯৪৯ সালে জন্ম। বয়সে আমার এক বছরের ছোট। বাস করেন টোকিও শহরে। যেদিন তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হয়, সেদিন বইয়ের দোকানের সামনে ক্রেতাদের লম্বা লাইন পড়ে যায়।

এই মুহূর্তে আমি মোরাকামির যে বইটি পড়ছি তার নাম *Blind Willow, Sellping Women*। এটি একটি গল্পের বই। সর্বমোট ২৪টি গল্প বইটিতে আছে। বেশির ভাগই পড়া হয়েছে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। প্রশস্ত বিছানায় লাল রঙের কমফর্টারের নিচে শুয়ে আছি। পা হট ওয়াটার বোটলে রাখা। হাতে জাপানি লেখকের গল্প। গল্পের নাম 'The kidney shaped stone that moves everyday'। গল্পটির সঙ্গে আমার লেখা 'পাথর' গল্পের অস্বাভাবিক সাদৃশ্য দেখে চমকাচ্ছি।

'আয়না' নামে তাঁর একটা গল্প পড়লাম। 'আয়না' নামে আমার নিজের একটা গল্প আছে। এই দুটি গল্পও কাছাকাছি।

আমার একটি গল্পে লিফটে করে এক পত্রিকা অফিসের পিয়ন অন্য এক জগতে চলে যায়, মোরাকামির একটি উপন্যাসের মূল নায়ক লিফটে করে উঠে অন্য এক জগতে চলে যায়।

আমি মোরাকামির লেখা আগে কখনো পড়িনি, এই প্রথম পড়ছি। এই

জাপানি লেখকের আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তা হলে কি লেখকদের মধ্যে অদৃশ্য অলৌকিক কোনো যোগসূত্র আছে?

ন্যুট হামসুনের *ভাগাবন্ড* উপন্যাসে একটি প্যারা আছে হুবহু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্যারা।

এডগার অ্যালান পোর কবিতার 'Annabe Lee' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এক গাঁয়ে' দুই ভাষায় লেখা এক কবিতা। এর অর্থ কী?

ক্যানসারে আক্রান্ত হুমায়ূন আহমেদ তাঁর দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী কী করে কাটাচ্ছেন, তা জানার বিপুল আগ্রহ বাংলাদেশের মানুষ দেখাচ্ছেন। কেন এই আগ্রহ তাও বুঝতে পারছি না। সময় প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা। একজনের সময়ে অন্যজনের উঁকি দেওয়াটাও মনে হয় ঠিক না। তবে আমি নিজেই চাচ্ছি কী করছি না করছি তার একটি রেকর্ড রাখতে। ডায়েরি লেখা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। অভ্যাস থাকলে ডায়েরি লিখতাম।

আজ নভেম্বরের ১২ তারিখ। রাত ১২টায় জন্মদিনের কেক কাটা হবে। আইসক্রিম কেক কেনা হয়েছে। ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এ অংশটি লেখা যেতে পারে। লাভ কী? অন্যের ব্যক্তিগত ডায়েরি পড়ে কেউ কি আনন্দ পাবে? আমি নিজে পাই না। ভুল বললাম। সালভাদর দালির ডায়েরি পড়ে আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁর আঁকা ছবি দেখে মনে হয়, তিনি ঘোরের এক জগতের বাসিন্দা। ডায়েরি ভিন্ন কথা বলে।

আমার অনেক দিনের অভ্যাস—জন্মদিনের রাতে নতুন একটা উপন্যাসে হাত দেওয়া, প্রথম দুই পৃষ্ঠা লিখে ফেলা। মাথায় গল্প এসে বসে আছে। তবে পরাবাস্তব ধরনের কাহিনি। আমেরিকান এক ভূতনির সঙ্গে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকার এক বাঙালি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর প্রণয়গাথা। দেখা যাক কী হয়?

নিউ ইয়র্কের প্রবাসী লেখকেরা তাঁদের বই প্রায় প্রতিদিনই পাঠাচ্ছেন। আমি গাজি কাশেম নামে এক লেখকের একটি বইয়ের প্রশংসা করে *কালের কণ্ঠে* একটি লেখা দিয়েছিলাম ('মিলন কেন দুষ্ট')। প্রবাসী লেখকেরা এই কারণেই কি আমার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন? আমি তাদের বই পড়ার চেষ্টা করছি। একজন আগ্রহ করে আমাকে তার রচনা পাঠাবে, আমি ফেলে রাখব, তা কখনো হবে না। কষ্টের ব্যাপার হলো, বইগুলো (বেশির ভাগই কবিতা) পড়তে ভালো লাগছে না।

আমার ভালো লাগা না-লাগা সাহিত্যের মানদণ্ড না। অনেক বিখ্যাত

AMARBOI.COM

উপন্যাসই আমার পড়ে ভালো লাগেনি। যেমন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*। আবার অতি সাধারণ উপন্যাসও মুগ্ধ হয়ে বারবার পড়েছি। উদাহরণ, সুবোধ ঘোষের *শুন বরনারী*।

পৃথিবীতে নানান ধরনের পাঠক আছে। আমি অতি নিম্নমানের পাঠক। আমি বই পড়ি গল্পপাঠের আনন্দের জন্য। পড়তে পড়তে বুকের ভেতর দুঃখের একটা মোচড় তৈরি হবে। চোখ পানিতে ভিজে আসবে, কিংবা ঝিলিক দিয়ে উঠবে আনন্দ, এই জন্যই পাঠ।

সব পাঠকেরই বই পড়ার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। আমার পদ্ধতিটা হলো, যার বই ভালো লাগে, তার সব বই পড়ে ফেলতে হবে। একটিও যেন বাদ না থাকে।

আমেরিকায় যখন প্রথম পড়তে আসি (১৯৭৮), তখন ন্যুট হামসুনের একটিমাত্র বই আমার পড়া ছিল। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে ন্যুট হামসুনের আরও দুটি বই পাওয়া গেল। পড়ে শেষ করলাম।

লাইব্রেরিয়ান বললেন, 'তুমি কি এই লেখকের আরও বই পড়তে চাও?'

আমি বললাম, তোমাদের কাছে তো আর বই নেই।

'আমরা আনিয়ে দিচ্ছি। আমরা আমেরিকার সব লাইব্রেরিতে খবর পাঠিয়ে দেব। যাদের কাছে ন্যুট হামসুনের বই আছে, তারা ধার হিসেবে আমাদের দেবে। তুমি পড়া শেষ করে বই ফেরত দেবে।'

এই হলো আমেরিকা। বই পড়তে হলে এ দেশের তুলনা নেই। পড়াশোনা করতে এসে কত বিচিত্র ধরনের বই-ই না এই আমেরিকায় পড়েছি। আবার পড়তে শুরু করেছি। ল্যাবি নিভানের একটি সায়েন্স ফিকশন অনেক দিন থেকে খুঁজছিলাম। আমাজান ডট কমে পাওয়া গেছে। তারা মেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শংকু আইচ (জুয়েল আইচের ভাই) পাঠিয়েছে Nook Book। এই বস্তু দিয়েও নাকি দুনিয়ার বই পড়া যায়। আমি হাইটেক পাঠক না। পাতা উল্টে বই পড়ার পাঠক। Nook Book-এর কী গতি হবে, কে জানে?

পাদটীকা

প্রবাসী লেখক ড. নুরুন নবীর *Bullets of 71* পড়ে শেষ করেছি। লেখক সম্পর্কে *Far Eastern Review* (মে ৬, ১৯৭২) বলছে—কাদের সিদ্দিকীর ডান হাত এবং Brain of the Force (অর্থাৎ মূল মাথা)।

AMARBOI.COM

ঐতিহাসিক কারণে বইটির অনেক গুরুত্ব। অনেক দিন পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি গ্রন্থ পড়ে আনন্দ পেয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় কাদের সিদ্দিকী সাহেবের বই পড়েও প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু পরিবারের হত্যার পর তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে হিন্দুস্তানে নির্বাসনে চলে যান। কাদের সিদ্দিকীর স্মৃতিকথা তখন কলকাতায় প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের অবস্থা তখন এমন যে, কেউ এই বই নিয়ে কোনো কথা বলবে না। আমার মনে আছে, কাদের সিদ্দিকীর বই নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম।

উনি লোক মারফত আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সরাসরি ডাক বিভাগ ব্যবহার করতেও হয়তো তিনি ভয় পাচ্ছিলেন।

আহা রে, কত বিচিত্র সময়ের ভেতর দিয়েই না আমরা গেছি!

২১ জুলাই ২০১২

AMARBOI.COM

১

আমার ঈদের নাটক

অনেক কাল আগে একটাই টিভি চ্যানেল ছিল—বিটিভি। আমার ঈদের নাটকের শুরু সেখানে। বিটিভি একটাই ঈদের নাটক প্রচার করত। সেই নাটক নিয়ে সবার আগ্রহ ছিল তুঙ্গস্পর্শী। ঈদের নাটক লিখতেন আমজাদ সাহেব। আমি মনে মনে ভাবতাম, ইশ্, এরা কি কোনো দিন আমাকে ডাকবে?

হঠাৎ এক ঈদে ডাক পেলাম। কী নাটক লিখেছিলাম মনে নেই। অভিনেতা-অভিনেত্রী কারা ছিলেন তাও মনে নেই। শুধু মনে আছে, প্রতি ঈদেই আমার ডাক পড়তে লাগল। আমি মহানন্দে একের পর এক হাসির নাটক লিখতে লিখতে ভাঁড়ে পরিণত হলাম।

এখন দিনকাল পাল্টেছে। বিটিভি ঈদে ২০-২৫টা নাটক, গোটা সাতেক টেলিফিল্ম প্রচার করে। তারা এখন আমাকে আর ডাকে না। তার পরও চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই একটা নাটক বানিয়ে পাঠালাম। আমাকে জানানো হলো, বিচারকমণ্ডলী নাটক দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিচারকমণ্ডলী এই যে খাটাখাটনি করবেন তার পেছনে খরচপাতি আছে। পাঁচ হাজার টাকা আলাদা জমা দিতে হবে।

দিলাম পাঁচ হাজার টাকা জমা। বিটিভি জানাল, নাটক মানসম্মত হয়নি বলে প্রচার হবে না। নাটকের নাম *হাবলংগের বাজারে*। আমি যে কটি ভালো নাটক বানিয়েছি এটি তার একটি। অন্য চ্যানেলে এই নাটকটি অনেকবার প্রচারিত হয়েছে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল পাঠকদের নাটকটি মনে করিয়ে দিচ্ছি—ডাক্তার এজাজ বিয়ে করতে রাজি না, কারণ তার 'লইজ্জা' লাগে।

এখন অনেক চ্যানেল। নাটকের চাষও ভালো হচ্ছে। প্রচুর উৎপাদন। ব্যস্ত নায়কেরা এক ঈদে ২৫ থেকে ৩০টা নাটক করেন। তার পরও মুখ শুকনা

করে পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দেন, 'এবার নাটক বেশি করতে পারিনি। কিছুদিন দেশের বাইরে ছিলাম এই কারণে।'

আমার নিজের নাটকের চাষও খারাপ না। প্রতি ঈদেই দেখি তিন থেকে চারটা নাটক প্রচার হচ্ছে। তবে 'লেড়কা সে লেড়কাকা গু ভারি'। বাচ্চার ওজন চার পাউন্ড, সে হাগু করেছে সাড়ে চার পাউন্ড। নাটক ৩৫ মিনিটের কিন্তু বিজ্ঞাপন ৫০ মিনিটের।

তবে এই সমস্যার সমাধান করেছি। আমি চ্যানেল আইকে বলেছি, কোরবানির ঈদে আমি একটাই এক ঘণ্টার নাটক লিখব। শর্ত হলো কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। চ্যানেল আই আমার শর্তে রাজি হয়েছে।

এই ঈদে তিনটি নাটক লিখেছি। পরিচালনাও করেছি। নাটকগুলো হলো—

রুবিক'স কিউব: প্রচার করবে চ্যানেল আই।

নষ্ট বাসর: প্রচার করবে এটিএন।

জেগে আছি: প্রচার করবে এনটিভি।

নিজের নাটক বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা শোভন না। নাটকগুলো লিখে আরাম পেয়েছি। বানাতে গিয়েও ভালো লেগেছে। এইটুকু সম্ভবত বলা যায়।

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা।

০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

AMARBOI.COM

২

ঈদ ভয়ংকর!

ভাবতে অবাক লাগে, একসময় আমার ঈদও আনন্দময় ছিল। তখন আমাকে ঈদসংখ্যায় উপন্যাস লিখতে হতো না। কারণ 'ঈদসংখ্যা' নামক কোনো বস্তু ছিল না। বিটিভিতে ঈদের হাসির নাটক লিখতে হতো না, এই দায়িত্ব আমজাদ হোসেন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বিটিভির কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের কাছে শুনেছি, আমজাদ হোসেনের কাছ থেকে ঈদের নাটক আদায় করা কঠিন ব্যাপার ছিল। মাঝেমধ্যে কাগজ-কলম দিয়ে

বিটিভির একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। নাটক শেষ হলে মুক্তি, তার আগে না।

মানুষের কোনো সুখই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমারও ঈদ-সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের ফাঁদে পড়ে এক ঈদে হাসির নাটক লিখতে রাজি হলাম। সবাই খাল কেটে কুমির আনে, আমি খাল কেটে অক্টোপাস নিয়ে এলাম। এই অক্টোপাস আমাকে আট পায়ে আঁকড়ে ধরল। বাংলাদেশের মানুষদের ঈদের দিনে হাসানো আমার পবিত্র এবং মহান দায়িত্ব হয়ে গেল।

যেকোনো দায়িত্বের সঙ্গে টেনশন থাকে, সেই দায়িত্ব যদি মহান হয়, টেনশন 'মহা' হয়ে যায়। আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করি রোজার শুরুতেই। স্ক্রিপ্ট লিখি, স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয় না। আবার লিখি, আবার লিখি।

বিটিভির রিহার্সেল রুমে রিহার্সেল হয়। প্রতিবারই আমি উপস্থিত থাকি। রিহার্সেল শুনে নাটক কাটাকুটি করি। প্রযোজক বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এত কাটাকুটি করলে কীভাবে হবে? প্রতিদিন নতুন সংলাপ দিলে আর্টিস্ট কীভাবে মুখস্থ করবে?'

বিখ্যাত সব আর্টিস্ট, প্রায়ই তাঁদের অভিনয়ের প্যাটার্ন আমার পছন্দ হতো না। মুখ ফুটে বলতে পারতাম না। যেহেতু হাসির নাটক, সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই ভাবতেন, দর্শক হাসানোর দায়িত্ব তাঁদের। অভিনয়ে স্থূল ভাব চলে আসত। স্বাভাবিক সংলাপ তাঁদের অভিনয়ের গুণে অস্বাভাবিক শোনাত।

দৃশ্যগ্রহণও আমার মনের মতো হতো না। বড় অভিনেতাদের মুখের ওপর সব সময় ক্যামেরা ধরা থাকত। ছোট অভিনেতারা বলতে গেলে ক্যামেরার আড়ালেই থাকতেন।

ইনডোরের শুটিং হতো দুই দিন। দ্বিতীয় দিনেই শুরু হতো তাড়াহুড়া। শেষ ঘণ্টা বাজার আগে দেখা যেত আট-নয়টি দৃশ্য ধারণ করা হয়নি। পরিচালক মাথায় হাত দিতেন।

বিটিভি জমানায় (অন্য কোনো চ্যানেল যে জমানায় আসেনি, সেই জমানা) ঈদের দিন ঘুম ভাঙার পর থেকেই আমি আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকতাম। রাতে নাটক আছে। না জানি কেমন হবে? যাদের জন্য নাটক বানানো হয়েছে, তারা পছন্দ করবে তো? প্রাণ খুলে হাসবে তো? আনন্দ পাবে তো? অসহনীয় টেনশনে ঈদ হয়ে যেত ভয়ংকর।

এরপর বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক নোংরা এবং বিষাক্ত পানি প্রবাহিত হয়েছে, আমার জন্য ঈদ ভয়ংকরই থেকে গেছে।

আগে একটা নাটক লিখতাম। টেনশন এক নাটকে সীমাবদ্ধ থাকত।

AMARBOI.COM

এখন এক ঈদে পাঁচ-ছয়টা করে নাটক লিখতে হয়। আমি নিজে প্রচারের দিন কোনো নাটকই দেখতে পারি না। কোনটা দেখব? দর্শকেরাও নাটক দেখেন না। তাঁরা দেখেন বিজ্ঞাপন। 'লেড়কা সে লেড়কাকা গু ভারি'র মতো নাটকের চেয়ে বিজ্ঞাপন ভারী হয়ে গেছে।

আমি কঠিন প্যাঁচে পড়েছি। গোদের ওপর ক্যানসারের মতো ঈদের নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈদসংখ্যার লেখা। আমি রক্তের মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করছি।

ক্লান্ত চোখ ও ক্লান্ত চোখের পাতা
তাহার চেয়েও ক্লান্ত আমার পা।
মাঝ উঠোনে সাধের আসন পাতা
একটু বসি?
জবাব আসে, 'না।'

৩০ আগস্ট ২০১১

AMARBOI.COM

১

প্রসঙ্গ প্রিয়তমেষু

যখনই কেউ আমার গল্প নিয়ে ছবি করেন, তখনই শঙ্কা বোধ করি। না জানি কী হবে। আমি নিজে যখন আমার গল্প নিয়ে ছবি বানাই, তখনো শঙ্কা থেকে মুক্তি পাই না। সে কারণেই হয়তো 'রসগোল্লা' কিছু তৈরি হয় না।

মোরশেদুল ইসলাম আমার লেখা *পুতুল* উপন্যাস নিয়ে প্রথম ছবি করলেন। ছবির প্রথম দিনের শুটিং পার্কে হচ্ছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম, লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনিই ক্ল্যাপস্টিক দিলেন। অনেক দিন পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন, 'ওই ছবিটা কেমন হয়েছে?' আমি জবাব না দিয়ে ননকমিটাল টাইপ হাসি হাসলাম।

ছবিটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। বড় মাপের অভিনেতারা সেখানে ছোট মাপের অভিনয় করেছেন এবং আমার ধারণা, কেউই মূল উপন্যাস পড়েননি। এত সময় কোথায়? নানা জায়গায় শিডিউল দেওয়া।

প্রিয়তমেষু ছবিটা নিয়ে একই কারণে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। ছবি দেখতে শুরু করেছি অনাগ্রহ নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনাগ্রহ দূর হলো। গল্পের ভেতর ঢুকে গেলাম। ছবি শেষ হওয়ার পর পরিচালককে টেলিফোন করে আমার মুগ্ধতার কথা জানালাম। সবার অভিনয় ভালো। ক্যামেরাম্যান মাসুম ভালো কাজ করেছেন। পরিচালক কাজ করেছেন ঠান্ডা মাথায়। প্রতিটি দৃশ্যেই তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। তাঁকে আবারও অভিনন্দন।

০৫ নভেম্বর ২০০৯

AMARBOI.COM

২

'শিখতে শিখতে এগোলাম'

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক ছবি খণ্ড খণ্ডভাবে অনেক পরিচালকই তৈরি করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ একটি বিশাল ব্যাপার। এই বিশাল ব্যাপারকে একটি ছবিতে তুলে আনা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ঘটনাগুলো আছে, সেগুলো যদি তুলে আনা যায়, তাহলে যেসব ছেলেমেয়ে মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তারা বুঝতে পারবে সে সময় কী ঘটেছিল। সেটা তাদের জানানো উচিত বলে আমি মনে করি। সম্প্রতি আমি ঘোষণা দিয়েছি, আর কোনো ছবি তৈরি করব না। *ঘেটুপুত্র কমলা* আমার শেষ ছবি। কারণ, একটি ছবি বানাতে গেলে আয়ু কমে যায়। আমি যতগুলো ছবি বানিয়েছি, প্রতিটি ছবিতে দুই বছর করে আয়ু কমে গেলে আমার অনেক আয়ু কমে গেছে। এ বয়সে আর আয়ু কমাতে চাইছি না।

AMARBOI.COM

আগুনের পরশমণি

আমার প্রথম ছবি *আগুনের পরশমণি*। এই ছবি যখন প্রথম বানাতে গেছি, তখন যে খুব বেশি জানি, তা নয়। আগে জানতাম, পরিচালক যখন লাইট, ক্যামেরা তারপর অ্যাকশন বলে, তখনই ক্যামেরা চালু হয়। কিন্তু কেন জানি এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা লাগল। শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে শব্দ তিনটি উচ্চারণ করলাম। লাইট জ্বলল, ক্যামেরা চালু হলো, অ্যাকশন শুরু হলো। ছোট একটা দৃশ্য ছিল। অল্প সময়েই শুটিং শেষ হয়ে গেল। শেষ হওয়ার পর সবাই হাততালি দিচ্ছে। আমিও হাততালি দিলাম এবং খুবই আনন্দ পেলাম। হঠাৎ দেখলাম, যিনি ক্যামেরাম্যান, তিনি খুবই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, সবাই আনন্দ-ফুর্তি করছে, আপনি তাকিয়ে আছেন কেন?' ক্যামেরাম্যান বললেন, 'স্যার, আপনি তো "স্টপ" বলেন নাই, ক্যামেরা চলতেছে। সব রিল শেষ হয়ে গেল।' পরে জানলাম, নিয়ম আছে, পরিচালক যতক্ষণ না ক্যামেরা বন্ধ করতে বলবে, ততক্ষণ ক্যামেরা চলতে থাকবে। প্রথম একটা জিনিস শিখলাম, শিখতে শিখতে এগোলাম। এই হলো আমার প্রথম ছবি বানানোর অভিজ্ঞতা।

আগুনের পরশমণি ছবিতে আমি পাকিস্তান আর্মির ভয়াবহতা দেখাব। দৃশ্যটি হলো—তারা (পাকিস্তান আর্মি) একটি ট্রাক ভর্তি করে লাশ নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে গর্ত করে তার মধ্যে লাশগুলো ফেলবে। ক্যামেরাটা এমনভাবে সেট করা

হলো যে যখন লাশ ফেলা হবে তখন সেগুলো ক্যামেরার ওপর দিয়ে যাবে। দেখতে ভালো লাগবে। মনে হবে, মানুষ শূন্যে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে গর্তেও ক্যামেরা ধরা আছে, যেখানে লাশগুলো পড়বে।

কিন্তু একটা সমস্যা তৈরি হলো। এতগুলো লাশ কোথায় পাওয়া যাবে! অবশেষে একটা ব্যবস্থা করা গেল। এফডিসির মূল ফটকের বাইরে প্রতিদিন অনেক উৎসুক মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। আর্টিস্টদের আসা-যাওয়া দেখা বা কখনো যদি অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া যায়—এই আশায়। এফডিসির ফটক থেকে ৪০-৫০ জন লোক ডেকে আনা হলো। তাদের গায়ে রক্ত মাখিয়ে তোলা হলো ট্রাকে। দেখলাম, খুবই ভয় পাচ্ছে লোকগুলো। তাদের শুধু বলা হলো, ফেলার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতে হবে। নিচে ফোম বিছানো আছে, ব্যথা লাগবে না। প্রথম একজনকে ফেলা হলো। দ্বিতীয়জনকেও ফেলা হলো। কিন্তু তৃতীয়জনকে যখন ফেলা হলো, তখন সে ফোমের ওপর পড়েই উঠে দৌড়ে পালানো শুরু করল।

শ্রাবণ মেঘের দিন

শ্রাবণ মেঘের দিন ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে একটি মেয়ে অভিনয় করেছিল। তার নাম শাওন। পরে তাকে আমি বিয়েই করলাম। যা-ই হোক, এই ছবির শেষের দিকের কাজ যখন শুরু করি, তখন শাওনের জন্ডিস হলো। ভয়াবহ জন্ডিস। কী করা? দুটো পথ তখন খোলা—এক. ছবি বন্ধ রেখে তার জন্ডিস ভালো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। দুই. জন্ডিস নিয়েই শাওনকে দিয়ে এ ছবির কাজ শেষ করা, যদিও এটা খুবই অমানবিক হবে।

কিন্তু এই ছবি নিজের পয়সায় বানাচ্ছি। টাকাপয়সা সব শেষ। দু-তিন মাস অপেক্ষা করলে অভিনেতাদের পাওয়া যাবে না। ফলে ছবিটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে। তখন আমি ওই অবস্থাতেই ছবির কাজ শুরু করলাম। আমার কোনো উপায় ছিল না। কোলে করে নিয়ে তাকে শুইয়ে দেওয়া হতো। যেদিকে তাকাত, সেদিকেই তাকিয়ে থাকত। এভাবেই শুটিং হলো। একটি দৃশ্যে অর্ধমৃত এই মেয়েকে নিয়ে নৌকায় করে ডাক্তারের কাছে ছুটছে জাহিদ হাসান ও মাহফুজ। শাওন কিন্তু তখন সত্যি সত্যি মরণাপন্ন। ওই দৃশ্যটা কিন্তু খুবই মানিয়ে গেল।

মাঝেমধ্যে রোগ বা সমস্যা ছবির জন্য সহায়ক হয়, এটা আমি প্রথম লক্ষ করলাম। শাওন চমৎকার অভিনয় করেছে। দর্শক দেখে মনে করেছে, মরণাপন্ন একটি মেয়ের অভিনয় চমৎকার করেছে সে। কিন্তু তারা জানে না, সত্যি সত্যিই মেয়েটি (শাওন) ভয়াবহ অসুস্থ ছিল এবং অসুস্থতা নিয়েই কাজ করেছে।

AMARBOI.COM

শ্যামল ছায়া

যেকোনো ছবি শুরু করার আগে প্রস্তুতি নিতে হয়। বেশি দিন আগে তো মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। তখনকার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির একটা মিউজিয়াম আছে। সেই সময়ের অস্ত্র সেখানে তারা প্রদর্শন করে। আমাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তারই একটি অংশ ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিল। তারা সব সময় আমার সঙ্গে কাজ করেছে। *শ্যামল ছায়া* ছবিতে একইভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। ছবিতে তাদের নাম উল্লেখ করা আছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রসহ অনেক কিছুই আমাকে তারা দিয়েছিল। বড় ঘটনা হলো একজন লেখক কীভাবে ছবি বানাতে গিয়ে আস্তে আস্তে ছবির ভেতরের টেকনিক জানতে শুরু করে।

শ্যামল ছায়ায় আমি একজন নামকরা চিত্রগ্রাহককে নিলাম—আনোয়ার হোসেন, অনেক ছবি করেছেন। পৃথিবীর নামকরা চিত্রগ্রাহকদের একজন তিনি। আমি খুবই খুশি হলাম যে ভালো একজন চিত্রগ্রাহক পাওয়া গেল। সমস্যা হলো, তিনি গরম সইতে পারেন না। ছবিটা হচ্ছে গরমের মধ্যে। কারণ, ছবির মধ্যে গরমকে আমার ধরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ড সব গরমকালে। প্রচণ্ড গরম, আমরা নদীতে কাজ করছি। কিছুক্ষণ কাজ করার পর আনোয়ার হোসেন গরম সহ্য করতে না পেরে একটা হাফ প্যান্ট পরে গলায় গামছা পেঁচিয়ে নদীতে নেমে পড়লেন। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম কখন তিনি পানি থেকে ওঠেন। কিন্তু তিনি আর ওঠেন না। কারণ জানতে চাইলাম, কিন্তু তিনি আর বলেন না। পরে জানা গেল, পানির স্রোতে তাঁর এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, পানি থেকে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মাঝেমধ্যে হয় কি, ছবি বানানোর সময় প্রকৃতি অনেক সাহায্য করে। কথাটির সম্পর্ক মুক্তিযুদ্ধের তিনটি ছবির সঙ্গে নেই। আমি এখন যে ছবি বানাচ্ছি—*ঘেটুপুত্র কমলা,* তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঘটনাটা বলি : সেটা হচ্ছে, একটি বাচ্চা ছেলে বোনের সঙ্গে কঞ্চি দিয়ে খেলা করছে একটি কলাগাছের ভেলার ওপর। ক্যামেরা তৈরি। ভেলার ওপর দুই ভাইবোন দাঁড়িয়েছে, এমন সময় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। বৃষ্টির পর সূর্যের আলোটা এমন হলো, তাতে রংধনু তৈরি হলো। পুরো দৃশ্যটা ধারণ করা হলো রংধনুর মধ্যে। দর্শক যখন দেখবে, তখন তারা মনে করবে যে অনেক কষ্ট করে রংধনু তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি এটা আমাদের উপহার দিয়েছে।

অনুলিখন

০৯ ডিসেম্বর ২০১০

AMARBOI.COM

মৃত্যুচিন্তা

১

মাইন্ড গেম

তাত্ত্বিক পদার্থবিদেরা (Theoretical physics) ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার চেয়ে মনে মনে অর্থাৎ কল্পনায় পরীক্ষা করতে পছন্দ করেন। এই পরীক্ষাগুলোকে বলে Thought experiment। শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল হলো চিন্তা পরীক্ষার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ।

আমরা আমজনতারা চিন্তা পরীক্ষা করতে পারি না। তবে Mind game বা চিন্তা খেলা খেলতে পারি। এই খেলা আমার বিশেষ পছন্দের। খেলার নমুনা দিচ্ছি। একটি আট বছরের বালকের সঙ্গে এই খেলা খেলছি। বালকটির নাম ধরা যাক শুভ্র। আমার এবং তার মধ্যে কথোপকথন—

আমি : *শুভ্র! কেমন আছো?*

শুভ্র : ভালো আছি।

আমি : *তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? মাকে নাকি বাবাকে?*

শুভ্র : দুজনকেই সমান সমান। (৯৯% শিশু এই জবাব দেবে)।

আমি : *ভালো করে চিন্তা করে বলো—সমান সমান?*

শুভ্র : হুঁ।

আমি : *আচ্ছা বেশ, এখন কল্পনা করো তুমি তোমার মাকে এবং বাবাকে নিয়ে নৌকায় করে যাচ্ছো [মাইন্ড গেম শুরু হয়ে গেল]*

শুভ্র : কল্পনা করছি।

আমি : *নৌকায় শুধু তুমি আর তোমার বাবা-মা? মাঝিও নেই।*

শুভ্র : আচ্ছা।

আমি : *এই তিনজনের মধ্যে শুধু তুমি সাঁতার জানো। বাকি দুজন সাঁতার জানে না। ok?*

AMARBOI.COM

শুভ্র : জি, ok.

আমি : *তুমি এতই ভালো সাঁতার জানো যে নৌকা ডুবে গেলে বাবা-মা দুজনের একজনকে বাঁচাতে পারবে। বুঝেছ?*

শুভ্র : বুঝেছি।

আমি : *এখন মনে করো নৌকা ডুবে গেল। তোমার বাবা-মা দুজনই ডুবে যাচ্ছেন। এখন বলো তুমি কাকে বাঁচাবে? বাবাকে না মাকে? [মাইন্ড গেম শুরু হলো]*

শুভ্র : দুজনকেই বাঁচাব।

আমি : *তোমাকে আগেই বলা হয়েছে তুমি শুধু একজনকে বাঁচাতে পারবে।*

বেশির ভাগ শিশু এই পর্যায়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। কারও কারও চোখে পানি এসে যায়।

মনের ওপর চাপ তৈরির এই কঠিন খেলা এখন আমি আর খেলি না। কারণটা বলি—

এক বালিকা মাইন্ড গেমের এই পর্যায়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমি মাকে বাঁচাব আর আল্লাহ বাবাকে বাঁচাবে।'

তখনই ঠিক করেছি, এই নিষ্ঠুর খেলা শিশুদের সঙ্গে খেলব না।

আমার এই মাইন্ড গেমের ফলাফল বলি। ১০০ ভাগ শিশুই বলেছে তারা মাকে বাঁচাবে। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধজন পাওয়া যায়, যারা বাবাকে বাঁচাতে চায়। ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের ছোট মেয়ে (লেখা) তাদের একজন। আমি তাকে বললাম, বাবাকে বাঁচাতে চাও কেন?

সে বলল, বাবা লেখক তো, এই জন্যে বাবাকে বাঁচাব।

তোমার বাবা লেখক না হলে মাকে বাঁচাতে?

অবশ্যই।

মিলনকন্যার কথাবার্তায় আমি খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। লেখক হওয়ার কারণে আমার শিশুপুত্র হয়তো বা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। বাস্তবে দেখা গেল সেই গুড়ে বালি না, একেবারে কঙ্কর।

পুত্র নিষাদের সব খেলাধুলা আমার সঙ্গে। আমি তার *টম অ্যান্ড জেরি* কার্টুন দেখার সাথি। ছবি আঁকার সাথি। সে যখন ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকে, তখন তার মা তাকে কঠিন শাসন করে। শুধু আমি বলি, ছবি সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে রাক্ষসের ছবিটা তো অসাধারণ!

এতকিছুর পরেও নিষাদের মাথায় তার মা ছাড়া কিছু নেই।

প্লেনে করে দেশের বাইরে যাচ্ছি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বিমান খুব বাম্প

AMARBOI.COM

করছে। আতঙ্কিত নিষাদ বলল, বাবা, তুমি মাকে বাঁচাও।

আমি বললাম, তোমাকে বা নিনিতকে বাঁচাতে হবে না?

সে বলল, আগে মাকে বাঁচাও।

লস অ্যাঞ্জেলেস, ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে গিয়েছি। ওদের একটা রাইড নিয়েছি। এই রাইডে থ্রিডির কিছু কাজ আছে। যাত্রার একপর্যায়ে প্রকাণ্ড এক গরিলার দেখা পাওয়া যাবে। থ্রিডির কল্যাণে গরিলাকে মনে হবে জীবন্ত।

যাত্রা শুরু হলো। একপর্যায়ে সত্যি সত্যি ভয়ংকর এক গরিলার (কিং কং) দেখা পাওয়া গেল। ভালোমতোই জানি, পুরো বিষয়টা থ্রিডি ক্যামেরার কারসাজি। তার পরও আমাদের নিজের কলিজা শুকিয়ে গেল। নিষাদ ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল—বাবা! আমার মাকে বাঁচাও। বাবা! আমার মাকে বাঁচাও।

পৃথিবীর সব শিশু তাদের মাকে বাঁচাতে চায়। মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত—এই (হাদিস?) কথা সব সময় বলা হয়ে থাকে। তার পরও মা কী করে শিশুসন্তানকে হত্যা করেন?

পত্রিকায় পড়লাম, এক মা তাঁর দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে পড়েছেন। এই মহিলা নিজে ঝাঁপ দিতে চাইলে ঝাঁপ দেবেন। অবোধ সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে কেন?

স্বামীর সঙ্গে রাগ করে স্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক মা সন্তান হত্যা করলেন। এই মা কেমন মা?

আমেরিকার এক তরুণী মা তাঁর নয় মাস বয়সী সন্তানকে মাইক্রোওয়েভ চুলায় ঢুকিয়ে চুলা চালু করে হত্যা করলেন। হত্যাকাণ্ডে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। কী ভয়ংকর!

বিড়ালকে নিজের সন্তান হত্যা করে খেয়ে ফেলতে আমি দেখেছি। বাঘও নাকি এ রকম করে।

আমরা কি বিড়াল এবং বাঘের ওপর উঠতে পারিনি? এখনো পশু হয়ে আছি?

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১

AMARBOI.COM

ছোটগল্প

ছোটগল্প

১

শবযাত্রা

আমি আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে মানুষটাকে দেখছি। গ্রামের আর দশটা মানুষের থেকে তাকে আলাদা করার কিছু নেই। কাঁচা-পাকা চুল, রোদে জ্বলে যাওয়া খসখসে চামড়া, চোখে ভরসাহারা দৃষ্টি। মানুষটা আমার সামনে বেঞ্চিতে বসে আছে। বসে থাকার ভঙ্গিটাও ক্লান্তির। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে। আমাদের ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের চোখেও কৌতূহল। তারা মজার কোনো কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

আমি লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনার নাম কী?

লোকটা সহজভাবে উত্তর দিল, আমার নাম রহমান মিয়া।

আমাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে তারা এই উত্তরেই মনে হয় মজা পেয়ে গেছে। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। সবার মুখেই চাপা হাসি। রহমান মিয়া নাম শুনে হাসি পাওয়ার কী আছে বুঝতে পারছি না। লোকটাকে দ্বিতীয় কী প্রশ্ন করব তা-ও বুঝতে পারছি না। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে চারপাশের কৌতূহলী দর্শক চাচ্ছে আমি লোকটির সঙ্গে কথা বলি।

আপনার শরীর ভালো?

জি ভালো।

আপনার ছেলেমেয়ে কী?

সর্বমোট চারজন।

উপস্থিত দর্শকদের একজন বলল, স্যার, ছেলেমেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করেন।

যে ভঙ্গিতে সে কথাটা বলল তাতে বোঝা যাচ্ছে নাম জিজ্ঞেস করার পরই আসল মজা শুরু হবে। কাজেই আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে

AMARBOI.COM

বললাম, আপনার ছেলেমেয়েদের নাম কী?

রহমান মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, নাম ইয়াদ নাই।

দর্শকেরা অনেকেই চাপা হাসি হাসল। একটা মানুষ তার ছেলেমেয়েদের নাম মনে করতে পারছে না। এর মধ্যে হাস্যরসের কিছু নেই। ঘটনাটা বেদনাদায়ক। অথচ অনেকেই হাসছে।

স্যার, আপনি জিজ্ঞেস করেন তার বাবার নাম কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রহমান মিয়া, আপনার বাবার নাম কী?

রহমান মিয়া শান্ত গলায় বলল, আমার বাবার নাম ইয়াদ নাই। বিস্মরণ হয়েছি।

দর্শকদের হাসি প্রবল হলো। আমার মনটাই খারাপ হলো। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়া কষ্টের ব্যাপার। হাসির ব্যাপার না। এটা নিয়ে মজা করার কিছু নেই। অথচ গ্রামের মানুষেরা হৃদয়হীনের মতো কাজটা করছে। এখানে এসে পৌঁছার পর থেকে বলছে, রহমান মিয়ারে খবর দিয়া আনতেছি। বড় মজা পাবেন।

সেই রহমান মিয়াকে আনা হয়েছে। সবুজ রঙের লুঙ্গি এবং সাদা রঙের একটা চাদর গায়ে সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে আমার সামনে বসে আছে। বেচারা তার ছেলেমেয়েদের নাম মনে করতে পারছে না, বাবার নাম মনে করতে পারছে না। গ্রামের মানুষেরা এতেই মজা পাচ্ছে। অথচ আমি পাচ্ছি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে লোকটির আলজেমিয়ারস ডিজিজ হয়েছে। যে রোগ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের হতে পারে, সেই রোগ নেত্রকোনা জেলার কলঘাটি গ্রামের রহমান মিয়ারও হতে পারে। রোগ মানুষ বিচার করে না।

দর্শকদের মধ্যে অতি উৎসাহী একজন বলল, স্যার, আপনি জিজ্ঞেস করেন কেন সে ছেলেমেয়ের নাম বিস্মরণ হয়েছে, বাবার নাম বিস্মরণ হয়েছে।

আমার আর কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঢুকে শীতল পাটিতে শরীর এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আশপাশের মানুষদের এভাবে রেখে যেতেও খারাপ লাগছে। কলঘাটি থেকে এরাই রিকশা ভাড়া করে রহমান মিয়াকে এনেছে। এদের আগ্রহ এবং উৎসাহে পানি ঢেলে দিতেও খারাপ লাগছে। কাজেই আমি বললাম, রহমান মিয়া, ছেলেমেয়েদের নাম আপনি ভুলে গেছেন কেন? বাবার নামই বা ভুলে গেলেন কেন? কিছু কিছু নাম আছে কেউ কখনো ভোলে না।

AMARBOI.COM

রহমান মিয়া বলল, মৃত্যুর পর সব ভুলে যায়। অল্পদিন আগে মৃত্যু হয়েছে বলে আমার নিজের নামটা মনে আছে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, আপনার মৃত্যু হয়েছে মানে কী?

গত বৈশাখ মাসে রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার মৃত্যু হয়েছে।

বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেছেন। আর এটা হচ্ছে আষাঢ় মাস। অর্থাৎ তিন মাস হলো আপনি মারা গেছেন।

দুই মাস উনিশ দিন।

দর্শকদের হাসি প্রবল হলো এবং আমিও বুঝলাম, কলঘাটি থেকে পঞ্চাশ টাকা রিকশা ভাড়া কবুল করে এই লোকটিকে আমার কাছে আনার কারণ আছে। তবে কারণটা যথেষ্ট না। লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ একজন মানুষ অনেক কিছুই বলতে পারে। তাকে নিয়ে মজা করা যায় না।

আপনি নিশ্চিত যে বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেছেন?

জি।

আপনার কবর হয়েছিল, না হয়নি?

কবর খোদা হয়েছিল, কিন্তু আমারে কবরে নামায় নাই।

কেন?

আমি তখন উঠে বসেছি। জিন্দা মানুষের মতো কথা বলেছি। পানি খেতে চেয়েছি। সবাই ভাবছে আমি জিন্দা।

আসলে আপনি জিন্দা না?

জি না।

আপনি মারা গেছেন, কিন্তু আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে?

আছে। আগের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু আছে।

কথোপকথন এই পর্যায়ে বন্ধ করতে হলো। কারণ, আমার নাশতা খাবার ডাক এসেছে। যে বাড়িতে আমি উঠেছি, সে বাড়ির কর্তা (হেডমাস্টার, সোহাগী হাইস্কুল) আমাকে ডাকতে এসেছেন। হেডমাস্টারদের চোখে ভুবনবিখ্যাত যে বিতৃষ্ণা থাকে, সেই বিতৃষ্ণা নিয়ে তিনি রহমানের দিকে তাকালেন। আশপাশের লোকদের দিকে তাকালেন এবং সমস্ত বিতৃষ্ণা চোখের নিমেষে ঢেলে ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বললেন, স্যার, একটু বিষয় আছে। ভিতরে আসেন।

বেশ কিছু নতুন নতুন জিনিস আমি গ্রামে এসে লক্ষ করছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে লোকসমক্ষে উচ্চারণ করা হয় না।

AMARBOI.COM

'স্যার, নাশতা খেতে আসুন' বলায় কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে—একটা বিষয় আছে। খাওয়া-দাওয়াকে 'বিষয়' বলা কি গ্রামে সর্বজনীন, না এই বাড়িটির বিশেষত্ব, তা এখনো বুঝতে পারছি না।

আমি হেডমাস্টার সাহেবের আশ্রয়ে তিন দিন ধরে আছি। তবে যথেষ্ট আদর-যত্ন করছেন। তবে কী কারণে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে আমি 'বোকা টাইপ' মানুষ। জগতের জটিলতা থেকে আমাকে দূরে রাখতে হবে। হেডমাস্টার সাহেব এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। পারলে একটা কাচের বয়ামে ভরে আমাকে রেখে দিতেন। সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে একটু মনক্ষুণ্ন।

হেডমাস্টার সাহেবের হাতে আমি কী করে পড়লাম, সেই গল্প এখানে অবান্তর। তবু বলে নিচ্ছি, তাহলে আমার অবস্থানটা পরিষ্কার হয়।

একটি দৈনিক পত্রিকায় আমি প্রতি সপ্তাহে কলাম লেখি। কলামের নাম 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'। হালকা বিষয়বস্তু নিয়ে হালকা কলাম। যেমন ঢাকা নগরের ভিক্ষুক। নগরের সৌন্দর্যের এরাও যে একটা অংশ এই সব হাবিজাবি। একটা কলাম লিখলাম ঢাকা শহরের অবহেলার পাখি 'কাক' নিয়ে। যখন যা মনে আসে তা নিয়ে লেখা। যেহেতু কলামগুলো রাজনৈতিক নয়, কাজেই কেউ সেসব গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে বলে আমার কখনো মনে হয়নি। আমার সব সময় মনে হতো, আমি এবং পত্রিকার কম্পোজিটর—আমরা দুজনই 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' কলামের নিবিষ্ট পাঠক।

এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো যখন আমার স্কুলের এক বন্ধু টেলিফোন করে বলল, 'তোর একটা কলাম পড়ে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে।' আমি খুবই চিন্তিত বোধ করলাম। রোমহর্ষক কোনো কলাম লিখেছি বলে মনে পড়ল না। আমি বললাম, কোন লেখাটার কথা বলছ?

সে অতিরিক্ত রকম আগ্রহের সঙ্গে বলল, ওই যে জোছনা নিয়ে লেখা। দোস্ত, তোর লেখাটা আমি অফিসের সবাইকে পড়ে শুনিয়েছি।

ও আচ্ছা।

ও আচ্ছা না। মারাত্মক লিখেছিস। স্কুলে র‍্যাপিড রিডারে পাঠ্য হবার মতো লেখা। অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে।

বন্ধুর উৎসাহে নিজেকে যুক্ত করতে পারলাম না—কারণ, লেখাটা এমন কিছু না। আমার অন্য সব লেখার মতোই হালকা, গভীরতাহীন। লেখাতে আমি ঢাকার মেয়রকে অনুরোধ করেছিলাম, নগরবাসীকে পূর্ণিমা দেখার

AMARBOI.COM

তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেন। ভরা পূর্ণিমার সময় ঢাকা নগরে তিনি যেন দু'ঘণ্টার জন্যে হলেও ইলেকট্রিসিটি অফ রাখেন। সেখান থেকে চলে গেছি গ্রামের বাঁশঝাড়ের পূর্ণিমায়। যে পূর্ণিমার নাম কাজলা দিদির পূর্ণিমা। লেখাটি শেষ করেছি গৃহত্যাগী পূর্ণিমায়। যে পূর্ণিমায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

আমার বন্ধু বলল, দোস্ত, তুই আমাকে পারমিশন দে, আমি তোকে কাজলা দিদির বাঁশবাগানের জোছনা দেখিয়ে আনব। তখন তুই এ রকম আরেকটা লেখা লিখতে পারবি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তোর অ্যাপয়েনমেন্ট-বুকে লিখে রাখ নেক্সট পূর্ণিমা কাজলা দিদির বাঁশবাগানের জোছনা। কথা দিচ্ছিস?

পূর্ণিমার তো দেরি আছে। এখনই কথা দিতে হবে?

হ্যাঁ, এখনি কথা দিতে হবে। আমি সরকারি চাকরি করি। তোর মতো ঝাড়া হাত-পা না যে যখন-তখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি। আমাকে আগেই ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। বল, ইয়েস।

আমি ইয়েস বলে ফেঁসে গেলাম। আমাকে একা নেত্রকোনা জেলার এই অতি অজপাড়াগাঁয়ে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে। কারণ, বন্ধু শেষ মুহূর্তে ছুটি পায়নি। যেহেতু আগেই সব খবর দেওয়া, আমাকে একাই আসতে হয়েছে। আমি না এলে বন্ধুর ইজ্জত থাকে না। সে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

পূর্ণিমা দেখার যে বিপুল আয়োজন হয়েছে তা খুবই হাস্যকর, কিন্তু আমি হাসতেও পারছি না। হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ির কাছে বিশাল এক বাঁশবন শলার ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। জঙ্গলে যা হয়, বাঁশগাছের সঙ্গে অন্য কিছু গাছও থাকে। সেই সব গাছ কুড়াল দিয়ে কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কারণ, হেডমাস্টার সাহেবকে জানানো হয়েছে, আমি বাঁশবনের জোছনা দেখতে চাই। বনের মাঝখানে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে। আমি চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রেখে জোছনা দেখব।

সমস্যা হচ্ছে, তিন দিন ধরে আকাশ মেঘলা। চাঁদের দেখা নেই। গত রাতে পূর্ণিমা ছিল—চাঁদের দেখা পাওয়া যায়নি। বৃষ্টি পাওয়া গেছে। সারা রাতই বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘে মেঘে কালো। আমি এক শ ভাগ নিশ্চিত, সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। আমি তাতে মোটেই দুঃখিত বোধ করছি না। আগামীকাল সকালে ঢাকায় চলে যেতে পারছি,

AMARBOI.COM

এতেই আমি আনন্দিত। পুরোপুরি নগরবাসী মানুষের জন্যে গ্রামের সব অভিজ্ঞতা সুখকরও না। গ্রামে বাস করতে এলে ধাক্কা খেতেই হবে।

ঢাকা শহরে আমি নিশ্চয়ই এমন কাউকে পাব না যার ধারণা, দু'মাস উনিশ দিন ধরে সে মৃত। যদি কেউ থেকেও থাকে, তার আত্মীয়স্বজন তার চিকিৎসা করবে। যত্ন করে ঘরে রেখে পুষবে না। দর্শনীয় বস্তু হিসেবে তাকে ভাড়া করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেবেও না।

হেডমাস্টার সাহেবের সব আয়োজনেই বাড়াবাড়ি থাকে। বৈকালিক নাশতার আয়োজন গুরুতর। নাশতা হিসেবে পোলাও করা হয়েছে। পোলাও এবং গরুর ভুনা মাংস।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা বিকালের নাশতা?

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, কফি আনিয়েছি। খানার পর কফি আর নোনতা বিস্কুট। আমি যথেষ্ট পরিমাণ আশ্বস্ত হয়ে পোলাও খেতে বসলাম। কারণ, 'না' বলে লাভ হবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে 'না' শব্দটির সঙ্গে এরা পরিচিত নয়। অতি সুখাদ্যও যে মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছা করে না, এই ধারণা সম্ভবত গ্রামের মানুষের নেই।

ঘিয়ে জবজবা পোলাও মুখে দিতে দিতে বললাম, রহমান মিয়া লোকটা সম্পর্কে হেডমাস্টার সাহেব, আপনি কী জানেন?

হেডমাস্টার মুখভর্তি পোলাও নিয়ে বললেন, হারামজাদাকে জুতাপেটা করা উচিত।

আমি বললাম, কেন বলুন তো?

ফাজলামি করছে না। সে জিন্দা না মুর্দা, এটা সে বলার কে? এটা হলো দশজনের বিবেচনা।

আপনাদের বিবেচনায় সে জিন্দা?

অবশ্যই। এমবিবিএস ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেছে।

সে যে বেঁচে আছে, এটা প্রমাণ করার জন্যে পাস করা ডাক্তার এসেছিল?

জি এসেছিল। পালস দেখেছে। ব্লাড প্রেসার মেপেছে। সব নরমাল।

একটা লোক কথা বলছে, হাঁটছে, খাচ্ছে। সে যে বেঁচে আছে, তার জন্যে এটাই যথেষ্ট না? পালস দেখতে হবে, ব্লাড প্রেসার মাপতে হবে!

হেডমাস্টার সাহেব জামবাটিভর্তি গরুর মাংসের প্রায় সবটা নিজের প্লেটে ঢেলে বললেন, গ্রাম হলো আপনার অশিক্ষিত মূর্খ জনগোষ্ঠীর বাস। এদের জন্যে পালস দেখা লাগে, ব্লাড প্রেসার মাপা লাগে।

AMARBOI.COM

এরা কি বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে রহমান মিয়া মৃত?

আপনাকে বলব কী? ষোলো আনা মানুষের মধ্যে দশ আনা বিশ্বাস করে রহমান মিয়া মারা গেছে।

বলেন কী!

হেডমাস্টার সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শিক্ষার আলো এই জন্যেই দিকে দিকে জ্বালানো দরকার। নবী করিম (সা.)-এর সহি হাদিস আছে, শিক্ষার জন্যে সুদূর চিনে যাও। আছে না?

জি আছে।

হেডমাস্টার সাহেব চতুর্থবারের মতো তাঁর প্লেটে পোলাও নিলেন। জিন্দা লাশকে দেখে আমি যেমন অবাক হয়েছিলাম, প্রায় সুতার মতো মরা হেডমাস্টার সাহেবের খাওয়া দেখেও প্রায় তেমন অবাকই হচ্ছি। আমি খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে ফেলেছি দেখে হেডমাস্টার সাহেব বাটির বাকি গোশত প্লেটে ঢালতে ঢালতে বললেন, কফি বানাচ্ছে। কফি খান। তারপর কাঁচা সুপারি দিয়ে একটা পান খেয়ে শুয়ে ঘুম দেন। আকাশের যে অবস্থা, আজ বোধ হয় চাঁদ উঠবে না। তবে আপনেরে কথা দিলাম, চাঁদ যত রাতেই উঠুক, বাঁশবনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যাব, কফি নিয়ে যাব ফ্লাস্কে করে। আরাম করে জোছনা দেখবেন। জোছনা দেখার সময় যেন মশা ডিসটার্ব না করে এই জন্যে গোব মাকা মশার কয়েল আনিয়ে রেখেছি।

আমি বললাম, আপনি আরাম করে ঘুমান। আমার দুপুরে ঘুমিয়ে অভ্যেস নেই। আমি বরং রহমান মিয়ার সঙ্গে গল্প করি।

খবরদার, ওই কাজটা করবেন না।

অসুবিধা কী? পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

যত ইন্টারেস্টিংই মনে হোক, কথা বলবেন না। আমার রিকোয়েস্ট। কথা বললে সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

কী সমস্যা, হেডমাস্টার সাহেব ব্যাখ্যা করলেন না। নিতান্তই নিরীহ একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে হেডমাস্টার সাহেবের এত অনাগ্রহের কারণ ধরতে পারলাম না। আমি এক কাপে দেড় পোয়া চিনি দিয়ে বানানো কফির পেয়ালা হাতে রহমান মিয়ার সঙ্গে গল্প করতে গেলাম।

আগ্রহী দর্শকেরা এখনো আছে। তারা আগে দাঁড়িয়েছিল, এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। মনে হচ্ছে, তারা আরও কিছু 'মজা'র প্রত্যাশী।

AMARBOI.COM

আমি রহমান মিয়ার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম, তা বোধ হয় সম্ভব হবে না। আমি চেয়ারে বসতে বসতে কী বলব না বলব, গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার মনে হচ্ছে, রহমান মিয়ার মনের ভেতরে কোনো বিচিত্র কারণে একটা ভুল ধারণা ঢুকে গেছে। ভুল ধারণাটা দূর করারও কেউ চেষ্টা করছে না। সবাই মজা পাচ্ছে। ভুল ধারণা দূর করা মানেই তো 'মজা'র সমাপ্তি।

রহমান মিয়া।

জি।

আপনি যে মারা গেছেন, এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

জি।

কখনো সন্দেহ হয় না?

না।

এত নিশ্চিত হলেন কীভাবে?

রহমান মিয়া প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাঁ হাত উঁচু করে আমাকে দেখান। আমি দেখলাম, হাতের তালুর নিচে চামড়া কালো হয়ে কুঁচকে আছে। কোঁচকানো কালো চামড়া মৃত্যুর প্রমাণ হতে পারে না। আমি কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছি। দর্শকদের একজন বলল, কুপির উপরে হাত ধরছিল। চামড়া পুইড়া গেছে। কোনো দুঃখ পায় নাই।

চামড়া পুড়ছে কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে না, নিশ্চয়ই এর কোনো ব্যাখ্যা আছে। যে স্নায়ু ব্যথাবোধ মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, সেই স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে বা এই-জাতীয় কিছু হয়েছে। ডাক্তাররা ভালো বলতে পারবেন। কুষ্ঠরোগে এ রকম হয় বলে শুনেছি। ত্বকের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়।

আমি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনাদের কী ধারণা? রহমান মিয়া মৃত?

বৃদ্ধ একজন দার্শনিকের মতো বলল, আল্লাহর আলমে বহুৎ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সবই আল্লাহপাকের কুদরত!

অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস করছেন সে মৃত?

আমি বিশ্বাসও করি না, আবার ধরেন, অবিশ্বাসও করি না।

সেটা কেমন কথা?

লক্ষণ বিচারে মাঝে মাঝে পাই জিন্দা। মাঝে মাঝে পাই মুর্দা। মুর্দারে কোনো সময় মশায় কামড়ায় না। রহমান মিয়ারেও মশায় ধরে না।

মেয়ে মশা রক্ত খায় তার পেটের ডিমের পুষ্টির জন্যে। রহমান মিয়ার

AMARBOI.COM

রক্তে হয়তো কোনো সমস্যা আছে, যে জন্যে মশারা তার রক্ত খাচ্ছে না।

জি, হইতে পারে।

আমার ধারণা, রহমান মিয়ার খুব ভালো চিকিৎসা হওয়া দরকার। তার রোগটা মনে। এই রোগ সারাতে হবে।

গরিব মানুষ। ভাত জোটে না, আবার চিকিৎসা!

আমি রহমান মিয়ার দিকে তাকালাম। প্রথমে যেভাবে বসেছিল, এখনো ঠিক সেইভাবেই বসে আছে।

হঠাৎ মনে হলো, রহমান মিয়ার মধ্যে খুবই অস্বাভাবিক কিছু আছে, যা বারবার আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিকতাটা কি বসে থাকার ভঙ্গির ভেতর, নাকি তাকানোর ভেতর? সে কারও দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

রহমান মিয়া।

জি।

তাকাও তো আমার দিকে।

রহমান মিয়া তাকাল। আমি বললাম, আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। না বলা পর্যন্ত চোখ নামাবে না।

জি আচ্ছা।

রহমান মিয়া তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বাভাবিকতাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে চোখের পাতা ফেলছে না। একবারও না। নিশ্চয়ই এরও কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমার বুকে ধক করে ধাক্কার মতো লাগল। ব্যাপারটা কী? আমার মনে হচ্ছে, আমি এই মানুষটাকে চোখের ভেতর দিয়ে অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি। যা দেখছি, তার সঙ্গে আমার চেনাজানা পৃথিবীর কোনো মিল নেই। আমি নিশ্চিত যে ভয় পেয়েছি বলেই এ রকম মনে হচ্ছে।

রহমান মিয়া!

জি।

তুমি মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাও না কেন? সব সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাক।

রহমান মিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল এবং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই।

তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, কেন সে মানুষের চোখের দিকে তাকায় না তা সে জানে, কিন্তু বলতে চাচ্ছে না।

AMARBOI.COM

রাতে আমার ঘুম হলো না। রহমান মিয়ার ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাড়াবার চেষ্টা করেও পারছি না। নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে। জীবিতদের মাঝখানে মৃত মানুষেরা ঘুরছে, এ ধরনের গল্পগাথা পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত। জম্বিদের নিয়ে রীতিমতো গবেষণামূলক গ্রন্থ আছে। কবর দেওয়ার পর মৃত মানুষ জীবিত হয়ে ফিরে আসে। পরিচিত জনদের সঙ্গে বাস করতে আসে। এরা না মৃত, না জীবিত। এরা 'জম্বি'। ড্রাকুলাদের গল্প তো সবারই জানা। জম্বিদের মতো ড্রাকুলারাও না মৃত, না জীবিত। আমাদের রহমান মিয়া এ রকম কেউ না তো?

আচ্ছা, এমনকি হতে পারে রহমান মিয়ার শরীর থেকে আত্মা চলে গেছে? তাহলে আত্মা ব্যাপারটা কী?

শেষ রাতের দিকে ঘুমুতে গেলাম এবং খুব সংগত কারণেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম—দেখলাম শবযাত্রার দৃশ্য। কবরখানার দিকে যাচ্ছি। আমাদের আগে আগে খাটিয়া যাচ্ছে। তবে খাটিয়াতে কোনো শবদেহ নেই। শূন্য খাটিয়া। শবদেহ আমাদের সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে কবরখানার দিকে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। হেডমাস্টার সাহেব ডেকে তুললেন। নান্দাইল রোড স্টেশন থেকে বারোটার সময় ট্রেন যাবে ঢাকার দিকে। এখন উঠে রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারব না। নাশতা রেডি আছে। রিকশাও রেডি। নাশতা খেয়েই রিকশায় উঠতে হবে। হাতে একেবারেই সময় নেই।

অতি দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নাশতা নিয়ে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেব গলা নিচু করে বললেন, ওই হারামজাদা সকাল থেকে এসে বসে আছে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। নট আ সিঙ্গেল ওয়ার্ড। হারামজাদা বাড়ি চিনে ফেলেছে। এখন রোজ আসবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কার কথা বলছেন?

রহমান মিয়া।

কী চায়?

আপনাকে কী নাকি বলবে? কিচ্ছু বলার দরকার নাই।

রহমান মিয়ার ওপর হেডমাস্টার সাহেবের তীব্র রাগের কারণ আগেও ধরতে পারিনি, এখনো ধরতে পারলাম না।

নান্দাইল রোড স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি। কাদাভর্তি রাস্তা। অনেক কষ্টে রিকশা টেনে টেনে নেওয়া হচ্ছে। রিকশা ধরে ধরে এগোচ্ছে রহমান মিয়া।

AMARBOI.COM

আমি বললাম, কিছু বলবে, রহমান মিয়া!

জি।

বলো শুনি।

কথাটা এখন ইয়াদ আসতেছে না।

মনে পড়ছে না?

জি না।

খুব জরুরি কথা?

জি।

তোমার নিজের বিষয়ে কিছু কথা?

জি।

আচ্ছা, ঠিক আছে, মনে করার চেষ্টা করো। আরেকটা কথা শোনো—ঢাকায় গিয়েই আমি তোমার বিষয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। সম্ভব হলে তোমাকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করব। ডাক্তারদের সঙ্গে আগে কথা না বলে তোমাকে নিতে চাচ্ছি না।

জি আচ্ছা।

আমাকে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলে, সেগুলো কি মনে পড়েছে?

জি না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। মনে করার চেষ্টা করো।

নান্দাইল রোড স্টেশনে অপেক্ষা করছি। খবর এসেছে, ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। হেডমাস্টার সাহেব আমার সঙ্গে আছেন। ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে তারপর যাবেন। হেডমাস্টার সাহেব রহমান মিয়াকে আমার ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। ছাতা হাতে তাকে মারতে পর্যন্ত গেলেন। আমি বললাম, হেডমাস্টার সাহেব, আপনি লোকটাকে সহ্যই করতে পারছেন না। কেন বলুন তো?

হেডমাস্টার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, আরে, একটা মরা মানুষের সাথে কী কথা?

মরা মানুষ মানে! কী বলছেন আপনি?

হেডমাস্টার সাহেব থু করে থুতু ফেলে বললেন, মরা না তো কী। ভালো করে তাকায়ে দেখেন, হারামজাদার মাথার উপরে শকুন উড়তেছে। যেখানে যায়, শকুন চলে আসে। দেখেন, নিজের চোখে দেখেন।

আমি দেখলাম, রহমান মিয়া রেন্ট্রি গাছের নিচে বেঞ্চিতে বসে আছে। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদাম খাচ্ছে। গাছের ডালে কয়েকটা শকুন। দুটো

AMARBOI.COM

শকুন রেললাইনের কাছে। এরা রহমান মিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিশ্চয়ই এরও কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা জানি না বলে অস্বাভাবিক লাগছে। আমি বললাম, রহমান মিয়ার বাড়িতেও কি শকুন আসে?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, শকুন আসে, শিয়াল আসে, কুকুর আসে। তার বাড়ির সবাই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সে এখন থাকে নিজের মতো। কেউ তারে জায়গা দেয় না।

তাই নাকি!

শকুন দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল। এই হারামজাদা কোত্থেকে নিয়ে এসেছে। গ্রাম ভর্তি হয়ে গেছে শকুনে।

বলেন কী!

গতকালকে আপনি তার সাথে কথা বললেন। সন্ধ্যার সময় দেখি, তিনটা শকুন ওড়াউড়ি করছে। শকুন আসা খুবই অলক্ষণ। এই জন্যেই তারে দূরে দূরে রাখি।

ট্রেন এসে পড়েছে, আমি ট্রেনে উঠলাম। আমাকে ট্রেনে উঠতে দেখে রহমান মিয়া জায়গা ছেড়ে উঠে এল। হেডমাস্টার সাহেব আবারও ছাতা নিয়ে তাকে মারতে যেতে চাচ্ছেন বলে মনে হলো। আমি হেডমাস্টার সাহেবকে হাতে ধরে থামালাম।

রহমান মিয়া জানালার পাশে এসে দাঁড়ান। আমি বললাম, কথাটা মনে পড়েছে?

রহমান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, বলো কথাটা কী, শুনি।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জানালা ধরে ধরে রহমান মিয়া এগোচ্ছে। সে বিড়বিড় করে বলল, কথাটা কেউ বুঝব না, আপনে বুঝবেন।

বলে ফেলো?

এখন আবার ইয়াদ হইতেছে না।

রহমান মিয়া হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন তাকে ছেড়ে চলে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, দুটো শকুন হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছে তার দিকে। শকুনরা যে অবিকল মানুষের মতো হাঁটে, এই তথ্য আমার জানা ছিল না। জগতের কত কিছুই তো মানুষ জানে না।

৬ নভেম্বর ১৯৯৮

AMARBOI.COM

২

রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলি, মস্তক

গল্প লেখার পেছনের গল্প: বিশ্বসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের গ্র্যান্ড মাস্টার আমেরিকান লেখক আইজ্যাক অ্যাসিমভ। ভূতের গল্পের আরেক গ্র্যান্ড মাস্টার হলেন স্টিফান কিং। ইনিও আমেরিকান। এই দুই লেখকই গল্প লেখার গল্প লিখতে পছন্দ করেন। আইজ্যাক অ্যাসিমভ আবার স্টিফান কিংয়ের এক কাঠি এগিয়ে। তিনি গল্পটি লিখে কত টাকা পেয়েছিলেন, কত পাওয়া উচিত ছিল, তাও লিখেন।

আমি এই দুজনের অনুপ্রেরণায় মাঝে মাঝে গল্প লেখার পেছনের গল্প লিখি। আমার গল্পগ্রন্থ *আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ*-এ এই কাজটি করেছি। কারও দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া দোষের কিছু না, হজম হয়ে যাওয়াটা দোষের।

'রস কষ শিঙাড়া বুলবুলি' লেখার পেছনে আছে প্লাটিনামঘটিত একটি রসায়নিক যৌগ। প্লাটিনাম অতি মূল্যবান ধাতু। ধনবান তরুণীদের গায়ে প্লাটিনামের তৈরি গয়না রুচি ও বিত্তের বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করে। দেখো, আমার কী রুচি, আমার কত টাকা। আমি প্লাটিনামের গয়না পরি।

সমস্যা হয়, এই প্লাটিনাম যখন শরীরের বাইরে না থেকে কেমোথেরাপির একটি যৌগ হিসেবে শরীরের রক্তে মেশানো হয়, তখন। এ শরীর বিষাক্ত করে তোলে। নার্ভের ওপর চেপে বসে। হাত এবং পায়ের আঙুল অবশ হতে শুরু করে। অবস্থা একপর্যায়ে এমন হয় যে, কোনো কিছু হাতের আঙুল ব্যবহার করে ধরা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, এখন আমি শার্টের বোতাম নিজে লাগাতে পারি না। অন্যকে এগিয়ে আসতে হয়। পুত্র নিষাদ জুতার ফিতা লাগাতে পারে না, তবে শার্টের বোতাম লাগাতে পারে। জুতার ফিতা বাঁধার কাজটি আদর্শ পত্নীর মতো শাওন করে। তার এবারের আমেরিকা ভ্রমণ হলো শিক্ষাসফর।

কেমোথেরাপি যে আমাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবে, তা আমার অনকোলজিস্ট প্রথম দিনেই বলেছেন। আমি লেখক এবং কম্পিউটারে লিখি না, আঙুলে কলম ধরে লিখি শুনে তিনি কিছুটা চিন্তিত হলেন। আমাকে বললেন, তুমি আঙুল দিয়ে লেখার চেষ্টা করে যাবে। এটা ব্যায়ামের মতো কাজ করবে। আর যদি এমন হয়, তুমি একেবারেই লিখতে পারছ না, তখন

AMARBOI.COM

তুমি মুখে বলবে, তোমার স্ত্রী লিখবে। এই বুদ্ধি কেমন?

আমি বললাম, ভালো বুদ্ধি। 'রস, কষ, শিঙারা, বুলবুলি' গল্পটি আমি নিজের আঙুল ব্যবহার করেই লিখছি। ভবিষ্যতে কী হবে, তা বলতে পারছি না। গল্প কী লিখব ঠিক করা আছে। জাপানি কথাশিল্পী হারুকি মোরাকামির একটি গল্পের ছায়ায় ব্যাঙ নিয়ে গল্প। আদি গল্পে টোকিও শহরের এক লোক তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দেখে ঘরে প্রকাণ্ড এক ব্যাঙ। ব্যাঙ মানুষের ভাষায় কথা বলতে থাকে। নিতান্তই রূপকথা-টাইপ গল্প, কিন্তু গল্প শেষ করার পর মনে হবে—এমন হতেও তো পারে। গল্পকারের এখানেই বাহাদুরি।

আমি ঠিক করেছি, ক্যানসারে আক্রান্ত এক যুবক তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দেখবে, প্রকাণ্ড এক ব্যাঙ তার বসার ঘরের সোফায় বসে কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। মামুনকে ঢুকতে দেখে সে বলল, আহা রে, পুরা তো ভিজে গেছেন। জ্বর তো বাধাবেন। গরম পানিতে একটি হট শাওয়ার নিন। আমি এর মধ্যে চা বানিয়ে দিচ্ছি। চায়ে চুমুক দিন। চায়ে চিনি ক'চামচ খান?

কলম হাতে নেওয়ার পর মনে হলো, আরেকজনের গল্পের ছায়ায় গল্প লেখার দরকারটা কী? আমি আমার মতো করে লিখি না কেন? জাপানি কথাশিল্পী ব্যাঙ নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন, আমি ফাঁদব বিড়াল নিয়ে। সে মানুষের ভাষায় কথা বলবে না। তার মানুষের ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন নেই। বিড়াল হচ্ছে বিড়াল। তার জন্য এক শব্দের ভাষা 'ম্যাঁও' যথেষ্ট। তবে বিড়ালটা মোরাকামির ব্যাঙের মতো কথা বলা শুরুও করতে পারে। লেখক কলম হাতে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলমের নিয়ন্ত্রণ অন্য কারোর কাছে চলে যায়। এ জন্যই গল্পে কী ঘটবে না ঘটবে, তা আগ বাড়িয়ে বলা যাবে না।

ভালো কথা, গল্পের নামকরণ আমি ধার করেছি, এটা বলা দরকার। নিউ ইয়র্ক মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহা আমাকে একগাদা বইয়ের তালিকা দিয়ে গেছে। কলকাতা বইমেলায় এই সব বই প্রকাশিত হবে, আমি চাই কি না! একটি প্রকাশিতব্য বইয়ের নাম—*রস কষ শিঙাড়া বুলবুলি মস্তক*। আমি ভাবলাম, ভালো তো। নাম হজম করে ফেললাম।

আরেকটা কথা, এই গল্প উত্তম পুরুষে শুরু করে থার্ড পারসনে চলে গেছি। বিষয়টা ইচ্ছাকৃত না, নিজের অজান্তেই ঘটেছে।

আসুন এখন মূল গল্পে—

আমার নাম মামুন। আমার বয়স ত্রিশ, তবে সার্টিফিকেটে আছে সাতাশ। এসএসসির ফরম ফিলাপের সময় আমাদের হেডস্যার সবার বয়স তিন বছর কমিয়ে দিলেন। এতে নাকি পরে অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। তিনি শুধু যে বয়স কমালেন, তা না, সবার জন্মতারিখ করে দিলেন ১ জানুয়ারি। এই কাজটি তিনি কেন করলেন, তা ব্যাখ্যা করলেন না। কুতুবপুর আদর্শ বালক বিদ্যালয়ের আমার ব্যাচের সব ছাত্রের জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি।

আজ পয়লা জানুয়ারি। সার্টিফিকেট হিসাবে আমার জন্মদিন। মূল জন্মদিনের তারিখ (১২ অক্টোবর, তুলা রাশি) আমার প্রায়ই মনে থাকে না, তবে ১ জানুয়ারি মনে থাকে। এই উপলক্ষে কেক কাটা হয় না, তবে আমি আগোরা সুপার মার্কেট থেকে এক পিস পেস্ট্রি কিনি, দাম ১০ টাকা।

জন্মদিন পালন করি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে। না, আমার সঙ্গে কেউ থাকে না। আমি একা মানুষ। জ্বলন্ত মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে বেসুরা গলায় গান ধরি।

হ্যাপি বার্থ ডে ডিয়ার মামুন
হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

তারপর পেস্ট্রি খাওয়া। পেস্ট্রি খাওয়ার সময় মাথা দোলাতে দোলাতে গাই—আই অ্যাম এ জলি গুড ফেলো...

আমার পড়াশোনা, বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পর্কে এখন বলা যেতে পারে। এসএসসিতে ফার্স্ট ডিভিশন, পাঁচটি লেটার। এইচএসসিতে ফার্স্ট ডিভিশন, লেটার নেই। বিএতে সেকেন্ড ক্লাস। এমএতে টেনেটুনে থার্ড ক্লাস। এমএ থার্ড ক্লাস হলো, এমএ ফেলের চেয়েও নিচে। কাজেই আমি কাউকে এমএ রেজাল্টের কথা বলি না।

যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, তাদের বিএ পাসের কথা জানাইনি। জানলে তারা আমাকে চাকরি দিত না। আমি ওভার কোয়ালিফাইড হয়ে যেতাম। আমি একটা প্রতিষ্ঠানের টি ম্যান বাংলায় কী হবে? চা-ওয়ালা? অফিস চলাকালে যে চা চায় তাকে চা বানিয়ে দিই। কফি বানিয়ে দিই। প্রতিষ্ঠানের নাম 'অন্যপ্রকাশ'। এরা নানা বইপত্র ছাপায়। বইয়ের প্রুফ নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক লেখকের বাসায় যেতে হয়। হুমায়ূন স্যারের বাসায় আমি অনেকবার গিয়েছি। তিনি আমাকে নামে চেনেন। আমার সঙ্গে রসিকতাও করেন। একদিন আমাকে বললেন, তোমার মামুন নাম শর্ট করে দাও। শেষের 'ন'টা ফেলে দাও। তাহলে সবাই তোমাকে মামু ডাকবে। আমি মাজহারকে বলে দেব, সেও তোমাকে মামু ডাকবে।

AMARBOI.COM

মাজহার স্যার হচ্ছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মালিক। হুমায়ূন স্যার এই কথা বললে তিনি অবশ্যই আমাকে মামু ডাকা শুরু করবেন।

মামু ডাকার দরকার নেই, আমাকে তিনি যে তুই তুই করে বলেন, এটা অসহ্য লাগে। আমি একজন গ্র্যাজুয়েট, এই খবরটা জানলে তিনি অবশ্যই তুই বলতেন না, তবে আমাকে চাকরিতেও রাখতেন না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কিছু লোক দরকার, যাকে মালিকপক্ষ তুই-তোকারি করতে পারে। মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করায় আনন্দ আছে।

আচ্ছা, থাক উনার কথা। আমি জন্মদিনের কথা বলি। অফিস থেকে বের হয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। আমি টি-ম্যান। সারা দিন অন্যের চা বানাই বলেই মনে হয় নিজের বানানো চা খেতে ভালো লাগে না। 'বিসমিল্লাহ' হোটেলে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা মালাই চা খাই। এরা চা-টা ভালো বানায়। দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে। সেই দুধে চা-পাতা দিয়ে আবার জ্বাল দেওয়া, জ্বাল দেওয়া। যারা এই চায়ের মজা পেয়ে যায়, তারা অন্য চা মুখে দিতে পারে না। মনে হয় এরা চায়ে সামান্য আফিমও দেয়, কারণ চা খাওয়ার পরপর নেশার মতো হয়।

চা শেষ করার আগেই ঝুম বৃষ্টি লেগে গেল। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমি বের হতে পারব না। আমার সঙ্গে ছাতা নেই। আমাকে যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। রিকশায় করে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। পাঞ্জাবির পকেটে হাত দেওয়ার বিষয়টা বলি। পাঞ্জাবির পকেটে আমার ধানমন্ডি ৩/এ-র অ্যাপার্টমেন্টের দুটো চাবি। একটা তালারই দুটো চাবি। প্রথমে একটা চাবি দিয়ে ক্লক ওয়াইজ ঘোরাতে হয়, তারপর দ্বিতীয় চাবি অন্য একটা ফুটায় ঢুকিয়ে অ্যান্টিক্লক ওয়াইজ ঘোরাতে হয়। এই চাবি আমার দূরসম্পর্কের মামা হাশেম আলী খান জার্মানি থেকে এনেছেন। তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের মূল দরজার চাবি।

আপনারা কি বুঝে ফেলেছেন আমি হাশেম মামার অ্যাপার্টমেন্টের একজন কেয়ারটেকার? হাশেম মামা থাকেন জার্মানিতে। আমি হাশেম মামার অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। তিন হাজার বর্গফুটের বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্রিজ আছে দুটো। একটা ফ্রিজের বোতাম টিপলে হড়হড় করে বরফ বের হয়। বসার ঘরে সোফার দাম এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। বসলে মনে হয় মাখনের দলায় বসেছি। এ থেকেই বোঝা যায় ঘটনা কী?

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের মাজহার স্যারের অ্যাপার্টমেন্ট ৩/এ-র

AMARBOI.COM

গলিতে। আমি যে একই গলিতে থাকি, তা তাঁকে জানাইনি। জানালেই ঝামেলা। নতুন অনেক কাজ ঘাড়ে নিতে হবে। তাঁর জন্য বাজার করে দেওয়া। তাঁর দুই ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা। মাজহার স্যার অবশ্য কয়েকবার আমাকে এই গলিতে দেখেছেন। প্রথম যেদিন দেখেন, সেদিন বলেছিলেন, এদিকে কী?

আমি বললাম, স্যার, আমার এক দূর সম্পর্কের মামার বাসা এই গলিতে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এখন চলে যাচ্ছি।

তিনি বললেন, ও, আচ্ছা আচ্ছা।

আমি বললাম, কিছু লাগবে, স্যার? আমার কোনো কাজ কি আছে?

তিনি বললেন, না। তুই কাল সকাল সাতটার আগে বাসায় চলে আসবি। ছেলে দুটোকে স্কুলে নিয়ে যাবি। তাদের মায়ের জ্বর।

আমি বললাম, জি, আচ্ছা, স্যার।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম, তিনি এ গলিতে আমাকে দেখলেও কখনো ভাববেন না এখানকার কোনো অ্যাপার্টমেন্টে আমি মোটামুটি রাজার হালেই বাস করি এবং আমার অ্যাপার্টমেন্ট তাঁরটার ডবল। প্রতিটি ঘরে ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি আছে। মূল শোবার ঘরের খাটে আছে ওয়াটার বেড, তোশকের ভেতর তুলার বদলে পানি ভরা। বিছানায় শুলে মনে হয় পানির ওপর শুয়ে আছি। এই জিনিস মাজহার স্যার চোখে দেখেছেন বলেও মনে হয় না। উনাকে একবার আমার অ্যাপার্টমেন্ট দেখাতে পারলে ভালো লাগত। না, উনাকে আনা যাবে না। উনাকে যেদিন আনব, তার পরদিন আমার চাকরি চলে যাবে। তবে হুমায়ূন স্যারকে একদিন দাওয়াত করে খাওয়াব। উনি আসবেন কি না, জানি না। মনে হয়, আসবেন না। উনাকে মাই ডিয়ার মনে হলেও উনি ভয়ংকর অহংকারী। তবে তিনি যদি আসতেন, তাঁকে একটা বিড়ালের গল্প শোনাতাম। বিড়াল নিয়ে দুটো উপন্যাস লিখেছেন। একটার নাম *বিড়াল*, আরেকটার নাম *পুফি*। দুটো আমি পড়েছি। তেমন কিছু হয়নি। আমি যে গল্পটা জানি, সেটার কাছে বিড়ালের কোনো গল্প দাঁড়াবে না। আল্লাহর কসম, নবীজির কসম।

অনেকক্ষণ হলো মামুনের চা শেষ হয়েছে, বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। পৌষ মাস, বৃষ্টির মাস না। কোনো কারণে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে যে বৃষ্টি হয়, সেটা থামে না। যতক্ষণ নিম্নচাপ, ততক্ষণ বৃষ্টি।

রাস্তায় নেমে মামুনের শরীর হিম হয়ে গেল। বৃষ্টির পানিতে না, আসমান থেকে বরফ পড়ছে। সেই সঙ্গে ঠান্ডা হওয়া। এই ঠান্ডায় হেঁটে ধানমন্ডি পর্যন্ত

AMARBOI.COM

যাওয়া যাবে না, তার আগেই নিউমোনিয়া ধরে যাবে। মামুনের শরীরের অবস্থা যা, তাতে নিউমোনিয়া ধরলে আর বাঁচানো যাবে না। তার পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়েছে। সে কেমোথেরাপি শুরু করেছে। নীলগঞ্জে বসতবাড়ি বিক্রি করে কেমোর খরচ চালাচ্ছে।

প্রতি পনেরো দিন পরপর একবার করে কেমোর ডেট থাকে। মামুনের কাছে আটটা কেমো দেওয়ার মতো টাকা আছে। তবে তার ধারণা, চারটা কেমোর পরপরই সে শেষ হয়ে যাবে। বাকি টাকাটা তখন কী হবে?

ক্যানসার ও কেমোর ব্যাপারটা সে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। এই সব বলে বেড়ানোর বিষয় না।

প্রথম কেমোর পর তাকে তিন দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো। চতুর্থ দিনে অফিসে যাওয়ার পর মাজহার স্যার বললেন, ঘটনা কী? অফিসে আসিসনি কেন? মামুন বলল, আমার খালাতো বোন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। তাকে ধরার জন্য দিনাজপুর গিয়েছিলাম।

মাজহার স্যার বললেন, পাওয়া গেছে?

মামুন বলল, না। সে বর্ডার ক্রস হয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। যার সঙ্গে পালিয়েছে, সে হিন্দু। নাম বিকাশ। আমার মনে হয় রুবিনা এই হিন্দুটাকেই বিয়ে করবে।

মামুন জানে, নতুন ধরনের অশ্রুচালিত গল্প বললে সহজে পার পাওয়া যায়। 'জ্বর হয়েছে বলে তিন দিন আসতে পারি নাই'—এই ধরনের গল্প পাত্তা পায় না। দ্বিতীয় কেমোর সময় অফিস কামাইয়ের গল্প সে তৈরি করে রেখেছে।

কোনো রিকশা নেই। মামুন হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। রাস্তায় পানি জমে গেছে। খানাখন্দের মধ্যে পা পড়লে জীবাণু সংক্রমণ হবে। তখন আর রক্ষা নেই। কেমোথেরাপি চলার সময় শরীরের ডব্লিউবিসি কমে যায়। রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

ঝোড়ো বাতাসের কারণে কারেন্ট চলে গেছে। চারদিক হঠাৎ অন্ধকার। যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তখন আলো হচ্ছে। মোটরগাড়ির হেডলাইটের আলো থাকায় রক্ষা। মামুন বুঝতে পারছে সে কোথায় যাচ্ছে।

পানিতে-কাদায় মাখামাখি হয়ে, গায়ে প্রবল জ্বর নিয়ে মামুন শেষ পর্যন্ত তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। চাবি দিয়ে তালা খোলাটাই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্বরের ঘোরে হাত কাঁপছে। চাবি ঘোরানো যাচ্ছে না। মামুনের কাছে মনে হচ্ছে, সে অনন্তকাল ধরে চাবি ঘোরাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল। মামুন বসার ঘরের বাতি জ্বালাল। ঘর আলো

AMARBOI.COM

হওয়ামাত্র তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। ঘরের এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা দামের সোফায় নোংরা একটা বিড়াল বসে আছে। বিড়ালটা তার মতো পানি-কাদা মাখানো। তারও হাত-পা কাঁপছে। মামুন ভেবে পেল না, এই বদবিড়াল ঢুকল কীভাবে? বন্ধ ঘরে কুকুর-বিড়াল ঢোকার উপায় নেই। মামুন কঠিন গলায় বলল, নাম। সোফা থেকে নাম বদের বাচ্চা।

মামুনকে হতভম্ব করে দিয়ে বিড়াল বলল, এক্সাইটেড হবেন না। এক্সাইটেড হওয়া কোনো কাজের কথা না। ওভার এক্সাইটেড হলে মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। আপনি বরং হট শাওয়ার নিন। হট শাওয়ার নিয়ে গরম এক কাপ চা খান। আমাকেও দিতে পারেন। আমার অবস্থাও আপনার মতো।

মামুন নিশ্চিত, তার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। তার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। পৃথিবী রূপকথার রাজত্ব না। এখানে পশুপাখি কথা বলে না।

বিড়ালটা সোফা থেকে নেমে বসার ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে গেল। আবার ফিরে এসে শরীর টান দিয়ে বলল, আমাকে কথা বলতে দেখে কি অবাক হচ্ছেন, মামুন ভাই?

তাকে মামুন ভাই ডাকছে? বিড়াল তাকে মামুন ভাই ডাকছে?

বিড়াল আবার সোফায় উঠতে উঠতে বলল, আমরা বিড়ালেরা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি, তবে সচরাচর বলি না। মানুষকে চমকে দেওয়ার প্রয়োজন কী! মামুন ভাই, আপনি মনে হয় ঠান্ডা না লাগিয়ে ছাড়বেন না। ছোট ভাইয়ের একটা কথা শুনুন, টেক এ হট শাওয়ার, প্লিজ।

মামুন একদৃষ্টিতে বিড়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ইংরেজি বলছে। মামুনের মাথা কি পুরো খারাপ হয়ে গেছে! উত্তেজিত হলে চলবে না। নিজেকে শান্ত রাখতে হবে। 'ঘরে কোনো বিড়াল নেই, সবই তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা'—এই ভাবতে ভাবতে সে বাথরুমের দিকে রওনা হলো। বিড়ালটা পেছন থেকে বলল, মামুন ভাই, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমরা দুই বোন এক ভাই ছিলাম। আপনি আমাদের বস্তায় ভর্তি করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ফেলে দিয়ে এলেন। মনে পড়েছে?

মামুন হট শাওয়ার নিচ্ছে। তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। গরম পানির আরামদায়ক উষ্ণতায় তার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বস্তায় ভর্তি করে তিন বিড়াল ফেলে দেওয়ার কথা তার মনে আছে।

বিড়াল বাথরুমে চলে এসেছে। সেখান থেকে বলল, মামুন ভাই! আপনার উচিত ছিল বস্তার মুখ খুলে দিয়ে আসা। খুলে দিয়ে যদি আসতেন আমার

AMARBOI.COM

বোন দুটো মারা যেত না। তিন দিন পর এক পাগল বস্তার মুখ খুলল বলে আমি বেঁচে গেলাম।

মামুন বলল, চুপ। এই হারামজাদা, চুপ।

বিড়াল বলল, অনেকক্ষণ শাওয়ার নিয়েছেন, এখন শুকনা টাওয়েল দিয়ে গা-টা মুছুন। গরম চা বা কফি কিছু একটা খান। শরীরের কাঁপুনি কমবে।

আমি কী করব, কী করব না, তা তোকে বলতে হবে না। বদের বাচ্চা!

বিড়াল বলল, ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ। মানুষের উচিত সব সময় সব অবস্থায় ভদ্র ব্যবহার করা। আপনার মাজহার স্যার যখন আপনাকে তুই ডাকে, তখন আপনার খারাপ লাগে না? আমারও লাগে।

মামুন বলল, চুপ।

বিড়াল বলল, একটি বিশেষ দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা যেমন তিন ভাইবোন, আমরাও তাই ছিলাম। আমার দুই বোন মারা যাওয়ার পরপর আপনার দুই বোন মারা যায়। মিলটা কি লক্ষ করছেন, মামুন ভাই? আপনি বেঁচে আছেন, আমি বেঁচে আছি। আপনার শরীর ভালো না, আমারও শরীর ভালো না। দুধ ছাড়া কিছুই খেতে পারি না। রোজ রোজ কে আমাকে দুধ দেবে?

আপনার চিকিৎসা শুরু হয়েছে, আমার হচ্ছে না। তবে আমরা দুজন একই সময়ে মারা যাব। মামুন ভাই! আপনার বাসায় কি দুধ আছে? আমাকে এক বাটি গরম দুধ কি দেওয়া যাবে?

মামুন শাওয়ার থেকে বের হয়েছে। সে ঠিক করেছে, বিড়াল কী বলছে না বলছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। ঘরে কোনো খাবার নেই, তবে পাউডার মিল্ক আছে। এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়া যেতে পারে।

মামুন দুটো টোস্ট বিস্কুট আর আধা গ্লাস দুধ খেল। বিড়ালটা সারাক্ষণই তার সামনে নানা কথা বলে যাচ্ছে। মামুন জানে, এই সবই হ্যালুসিনেশন। এই গলিতেই লেখক হুমায়ূন আহমেদ থাকেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি মিসির আলীর মতো সব বুঝিয়ে দেবেন। বিড়াল যা ইচ্ছা বলুক, তার কথায় কান না দিলেই হবে। বিড়াল কথা বলেই যাচ্ছে।

মামুন ভাই! আধা গ্লাস দুধ আমার জন্য রেখে দিয়েছেন? আপনি পুরো গ্লাস শেষ করুন। আপনার শরীরে পুষ্টি দরকার। আমাকে আধা গ্লাস দুধ দিলে খেতে পারব না। বাটিতে ঢেলে দিন। সঙ্গে একটা টোস্ট বিস্কুটও দিতে পারেন। একটু

AMARBOI.COM

কষ্ট করে বিস্কুটটা যদি দুধে ভিজিয়ে দেন, আমার জন্য সুবিধা হয়।

মামুনের কাছে এখন মনে হচ্ছে, বিড়ালের মানুষের মতো কথা বলা অনেক পরের ব্যাপার, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। তার পরও মামুন বাটিতে গ্লাসের দুধ ঢেলে একটা টোস্ট বিস্কুট ছেড়ে দিল। বিড়াল বলল, থ্যাংক ইউ, ভাইয়া।

মামুন নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, বস্তায় ভরে তোমাদের ফেলে আসাটা আমার অন্যায় হয়েছে। আই অ্যাপোলোজাইজ।

বিড়াল বলল, নো মেনশন। ভাইয়া, দুধে এক চামচ চিনি দিয়ে দেবেন? ঘরে চিনি কি আছে?

মামুন এক চামচ চিনি দুধে ঢেলে ঘুমাতে গেল।

ঘরে ভয়াবহ ঠান্ডা। লেপের নিচেও মামুন কাঁপছে। বিড়ালটা খাটের নিচে। কার্পেটে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে কথা বলেই যাচ্ছে। মামুন এখন কথার জবাবও দিচ্ছে।

মামুন ভাই! আপনাকে একটা বুদ্ধি দেব?

কী বুদ্ধি?

মাজহার স্যার মাঝে মাঝে চেক দিয়ে টাকা ভাঙানোর জন্য ব্যাংকে পাঠান না?

হুঁ।

বড় অ্যামাউন্টের চেক দিলে টাকা নিয়ে ডুব দেবেন। আপনার চিকিৎসা চলছে, এখন টাকা দরকার।

অন্যের টাকা নেব?

বিড়াল বলল, আগে তো জানে বাঁচবেন, তারপর অন্য বিবেচনা। আপনার বেঁচে থাকা আমার জন্য জরুরি। আপনি বেঁচে থাকলে আমি বেঁচে থাকব।

তোমার অসুখটা কী?

আপনার যা, আমারও তাই। তফাত একটাই—আপনার চিকিৎসা হচ্ছে, আমার হচ্ছে না।

মামুন বলল, তুমি চাইলে তোমাকে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারি।

বিড়াল হাই তুলতে তুলতে বলল, ওকে।

মামুন বলল, বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। লেপের ভেতর ঢুকবে? এসো, চলে এসো। মামুন লেপ উঁচু করল। বিড়ালটা লাফ দিয়ে লেপের ভেতর ঢুকে

AMARBOI.COM

কুণ্ডলী পাকিয়ে পেটের কাছে শুয়ে পড়ল।

মামুন বলল, সরি!

বিড়াল বলল, সরি কেন বলছেন, ভাইয়া?

তোমাদের বস্তায় ভরে ফেলে দিয়েছিলাম, এই জন্য, সরি।

পুরোনো কথা ভেবে মনে কষ্ট পাবেন না। আরাম করে ঘুমান।

মামুন ঘুমাচ্ছে। ক্যানসার রোগীর পরাবাস্তব জগতে আরামের ঘুম। এই জগতে তার পেটের কাছে কালো একটা বিড়াল একই সঙ্গে আছে এবং নেই। শ্রোডিনজারের বিড়ালের মতো।

ঘুমের মধ্যে মামুন সুখের এক স্বপ্ন দেখল। তার বড় দুই বোন রস কষ শিঙাড়া বুলবুল খেলছে। কালো বিড়ালটা তার দুই বোনকে নিয়ে খেলা দেখছে। বিড়াল ভাইবোন খুবই আনন্দ পাচ্ছে।

অনেক দূর থেকে গম্ভীর গলায় কেউ একজন বলল, খেলা বন্ধ। টাইম ইজ আপ।

মামুনের দুই বোন খেলা বন্ধ করছে না। খেলেই যাচ্ছে—রস কষ শিঙাড়া বুলবুল মস্তক। রস কষ শিঙাড়া বুলবুল মস্তক। রস কষ শিঙাড়া বুলবুল মস্তক।

মাজহার স্যার দুই লাখ টাকার একটা চেক দিয়েছেন, ক্যাশ টাকা আনার জন্য। তিনি বললেন, সঙ্গে কাউকে দিতে হবে, না একা আনতে পারবে?

মামুন বলল, একাই আনতে পারব, স্যার।

গাড়ি আছে কি না দেখো। গাড়ি না থাকলে রিকশা নিয়ে যাও।

মামুন চেক ভাঙিয়ে অফিসে গেল না। দুই হাফ তেহারি কিনে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেল। টাকাটা তার কাজে লাগবে। পাসপোর্ট করাই আছে। সে চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়া চলে যাবে। বিড়ালটাকে সঙ্গে নিতে হবে। ট্রাংকে ভরে নিয়ে যাবে, সমস্যা হবে না।

মামুন একাই দুই হাফ তেহারি খেল। বিড়ালটা তেহারি খেল না। তার জন্য দুধ। দুপুরে আরামের ঘুমের জন্য সে শুয়েছে। বিড়ালটা আবারও তার পেটের কাছে। মামুন বলল, ভয় নেই। আমি তোমার চিকিৎসা করাব।

বিড়াল বলল, থ্যাংক ইউ, ভাইয়া।

মামুনের চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আছে। আগের রাতের স্বপ্ন ফিরে এসেছে। মামুনের দুই বোন অতি দূরের কোনো অঞ্চল থেকে অলৌকিক সুরে গাইছে—রস কষ শিঙাড়া বুলবুল মস্তক। রস কষ শিঙাড়া বুলবুল মস্তক।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২

AMARBOI.COM

সা ক্ষা ৎ কা র

সাক্ষাৎকার

১

'প্রতিটি লেখক এক অর্থে ধর্মপ্রচারক'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজ্জাদ শরিফ** ও **ব্রাত্য রাইসু**

সাজ্জাদ শরিফ : *আপনার লেখার মধ্যে আপনি প্রায়ই কিন্তু একটা কল্পরাজ্য তৈরি করেন। কল্পরাজ্য কী রকম, ধরা যাক ময়ূরাক্ষী নদী। ওই নামে হিমুর একটা নদী আছে। কঠিন একটা অবস্থায়, একটা কট্টর বাস্তবের সামনে এসে যখন সে দাঁড়ায়, তখন সে ওখানে যায়। এবং সে একধরনের প্রশান্তি নিয়ে আসে।*

হুমায়ূন আহমেদ : যাঁরা খুব যৌক্তিক তাঁরা এটার ব্যাখ্যা ভালো দিতে পারবেন। আমার কাছে একধরনের ব্যাখ্যা আছে। সেটা এই যে, আমার নিজের বোধহয় কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস, যদি বা থাকে, খুব কম। যেহেতু সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছি না, সেহেতু সমস্যাটা পাশ কাটিয়ে আসার একটা প্রবণতা আমার থাকে।

সাজ্জাদ : *এমন হতে পারে যে, আপনি হয়তো আপনার চরিত্রগুলোর একধরনের অভিভাবকত্ব নেন। জটিল কোনো অবস্থায় তাদের ফেলে আপনি দেখাতে চান না।*

হুমায়ূন : আমি নিজে যখন কোনো বিপদের মধ্যে পড়তে চাই না তখন।

সাজ্জাদ : *যেমন আপনার মেয়ে চরিত্রগুলোর কথা বলি; তারা জগতের সব গ্লানি থেকে দূরে থাকে। তারা জগতের সব রকমের কদর্য, কলুষ থেকে দূরে থাকে। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার তুলনা টানা যায়। এঁদের মেয়ে চরিত্রগুলোও শুভ্র ও পবিত্র। আপনার মেয়ে চরিত্রগুলোর খল বা ধূর্ত না হওয়ার পেছনে কারণ কী?*

হুমায়ূন : তারা যে শুভ্র, তা না। তাদের ভেতরকার নানা রকম দোষত্রুটি স্বীকার করা হয়। সেগুলো এত দ্রুত এবং কম সময়ে টেনে যাই যে জিনিসটায় আমার মন খারাপ হয়। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই। একটা উপন্যাসে

AMARBOI.COM

কোথাও এ রকম বলা আছে যে, একদিন ভোরবেলায় মেয়েটি রাস্তায় যায়। মেয়েটির জীবনে এ রকম এক ভোরবেলায় একটা কিছু ঘটেছিল, যা ঘটেছিল তা আনন্দের নয়। কিন্তু কী ঘটেছিল, সেটাও কোথাও কাউকে কিছু বলে না। আমি জানাতে চাই না কী ঘটেছিল। আমি শুধু একটা ইঙ্গিত দিয়ে যাই। দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, যে, এমন চমৎকার সকালটা তার পছন্দ হয়নি। তার মানে চমৎকার সকালে কোনো কিছু ঘটেছিল তার জীবনে। আমি যদি সেখানে ডিটেইল একটা বর্ণনা দিতাম সকালবেলা কী ঘটেছিল, তাহলে বোঝা যেত যে এই মেয়েটি, এই শুভ্র চরিত্রটি, যাকে সব কলঙ্ক থেকে মুক্ত মনে হয়, সে শুভ্র থাকতে পারে না। আর অভাবের কথা আমি বলতে ভালোবাসি না। কারণ, আমি নিজেই সে অভাবের ভেতর দিয়ে এসেছি, আমি ভালো করেই জানি অভাব কী জিনিস। এখন, লেখার সময় মনে করুন সেই অভাবের দিকটা আমি ফুটিয়ে তুলব। তখন এত দ্রুত কাজটা আমি সারতে চাই যে বইটা পড়ার পরে যাতে পাঠকের আর ব্যাপারটা মনে না থাকে।

সাজ্জাদ : *পাঠকের ওপর আপনি কোনো চাপ তৈরি করতে চান না।*

হুমায়ূন : যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। খেতে বসেছে, সে সময় বাচ্চাটি বলল, মা আজকে আমি গোটা ডিম খাব। এর মধ্যে দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি, সে কখনো গোটা ডিমটা খেতে পায় না। এই লাইন দিয়ে আমি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা বোঝাতে চেষ্টা করছি। ওই যে টাকা নাই, বাজার কী হবে, এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

সাজ্জাদ : *আপনার যেটা প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটা সংযম। যেমন আপনার হাস্যরস থাকে, কিন্তু সেটা কখনো বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যায় না।*

হুমায়ূন : মাঝে মাঝে খুব সিরিয়াস কথা বলার থাকে। এই কঠিন কথাগুলো হাসির মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছি। এই চেষ্টাটা কিন্তু আমরা সবাই করি। এটা আমাদের ক্রাইটেরিয়া। শুধু আমাদের সাহিত্যে নেই। আমাদের বাস্তব জীবনেও কিন্তু আমার কঠিন সমস্যার সময় হাসি-তামাশা-রসিকতা করে কঠিন ব্যাপারগুলো নিই। কিন্তু যখন লেখালেখি করি এগুলো খুব খারাপ একটা ব্যাপার। আমি ডিল করি হাসি-তামাশা-রসিকতা নিয়ে। উদাহরণ, একটা দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখাতে চাইছি। সেখানে দেখালাম যে, বাবা চরিত্রটি বাজার থেকে সবচেয়ে সস্তায় যে মাছ পাওয়া যায় সেগুলো কিনে নিয়ে আসেন, এবং সে মাছগুলো পচা। যেহেতু মাছগুলো পচা, কাজেই সেগুলো রান্না করতে হয় লেবুপাতা দিয়ে। তখন একটা চরিত্র বলল, আমাদের একটা লেবুর গাছ আছে, সেটার সব পাতা আমরা খেয়ে ফেলেছি। পুরো

AMARBOI.COM

ব্যাপারটা কিন্তু একটা হাস্যরস তৈরি করল। কিন্তু পেছনের যে গভীর বেদনাটি, সেটি আমি হাস্যরস দিয়ে ঢেকে দিলাম। হয়তো এটা করা উচিত ছিল না।

সাজ্জাদ : *আগে আপনার মেয়েরা সব ধরনের কলুষ এবং কদর্যতার বাইরে ছিল। পরে আপনি নিজেই কিন্তু কিছু জিনিস শুরু করেছেন, কিন্তু হালকাভাবে। আপনার* প্রিয়তমেষু *উপন্যাসে একটা মেয়ে কোনো এক সময় ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পুরো উপন্যাসটার ভেতরে আমরা জানতে পারি না যে সে আসলে তার দুলাভাইয়ের দ্বারা রেইপ্‌ড্‌ হয়েছিল। একদম শেষ অধ্যায়ে গিয়ে আপনি খুলে বললেন। তখন কিন্তু পুরো উপন্যাসটাই প্রথম থেকে ঘুরে গেল।*

হুমায়ূন : এর ফলে দ্বিতীয়বার পড়তে গেলে খুব মজা লাগবে।

সাজ্জাদ : *আপনি কি হঠাৎ করেই চিন্তা করেছেন যে এদিকটায় আসা উচিত?*

হুমায়ূন : সচেতন কিছু না। আমার সবকিছুই অচেতনভাবে আসে। সচেতনভাবে পরিমার্জনা যা করি সেগুলো সায়েন্স ফিকশনে।

রাইসু : *মানবিকতাটা রাখার জন্য?*

হুমায়ূন : না, সায়েন্সের ব্যাপারগুলো যাতে ঠিকমতো আসে। এ নিয়ে আমি সাবধান থাকি সায়েন্স ফিকশনে।

সাজ্জাদ : *সায়েন্স ফিকশনে কি আপনি একধরনের যৌক্তিক বিন্যাস রাখতে চান? মানে অনেকে তো সায়েন্স ফিকশনকে নিয়ে যান ফ্যান্টাসির দিকে।*

হুমায়ূন : ফ্যান্টাসি জাতীয় লেখাগুলো আবার আলাদা। ফ্যান্টাসি যে আমি লিখি না, তা না।

রাইসু : *সায়েন্স ফিকশনে আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা হলো আধ্যাত্মিকতা। কোনো কোনো সায়েন্স ফিকশন শেষের দিকে আধ্যাত্মিক হয়ে যায়।*

হুমায়ূন : শেষ পর্যন্ত তো সবকিছুই রিলিজিয়াস। এই যে বিজ্ঞান, এ-ও তো একধরনের ধর্ম।

রাইসু : *রিলিজিয়ন খুব ক্রুডভাবে চলে এলে ভালো লাগে না।*

সাজ্জাদ : *ক্রুড রিলিজিয়ন না, সাট্‌ল্‌ রিলিজিয়ন। যেমন* ফিহা সমীকরণ*-এর কথা বলতে পারি। যেমন* ইরিনা*-র কথা বলি। যারা নাকি অমর হয়ে যাবে। এই জায়গাগুলোতে কোথায় যেন একধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে। এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সব ব্রহ্মাণ্ডকে যে নাকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, তার যে দ্বন্দ্ব সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং।* ফিহা সমীকরণ*-এর মধ্যে আমরা দেখব ধর্মগ্রন্থের আকারে আপনি কতগুলো টেক্সট রচনা করেছেন। সেই টেক্সটকে ধীরে ধীরে ভাঙতে ভাঙতে আপনি একটা বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এই জিনিসগুলো আপনি কীভাবে ডেভেলপ করেন?*

AMARBOI.COM

হুমায়ুন : আমাদের সভ্যতার শুরুতে আমরা তো সমুদ্র থেকে উঠে আসলাম। আমাদের প্রাণের শুরু সমুদ্র থেকে। যে জন্য আমাদের রক্তের ঘনত্ব আর সমুদ্রের পানির ঘনত্ব এক। আমাদের রক্তের আরএইচ আর সমুদ্রের আরএইচ এক। আমাদের শরীরের লবণাক্ততা সমুদ্রেরই মতো। সেহেতু সমুদ্র দেখলে সমুদ্রের কাছে যেতে ইচ্ছা করে আমাদের। এটা আমি নিজে অনুভব করি। সমুদ্রের পাশে, বিশেষত রাত্রিবেলা দাঁড়ালে, শোনা যায় যে সমুদ্র ডাকছে। এক্কেবারে পরিষ্কার শোনা যায়। এবং আমরা উঠে এসেছি সমুদ্র থেকে। আমরা সব শরীরে সমুদ্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছি। আমাদের পুরো শরীরে আছে সমুদ্র।

সাজ্জাদ : *সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কি এ জন্যই বাড়ি বানাচ্ছেন নাকি?*

হুমায়ুন : সমুদ্র হচ্ছে আমাদের মা। সমুদ্র আমাদের ডাকবে না তো কে ডাকবে? আমরা হচ্ছি স্তন্যপায়ী। তো আমরা উঠে এসেছি সমুদ্র থেকে। হঠাৎ করে একটা ডিসিশন হলো আমাদের। আমরা একদল স্থির করলাম যে শুকনাতেই থাকব। আরেক দল বলল, না, আমরা অবশ্যই সমুদ্রে থাকব। একটা দল থেকে গেল সমুদ্রে। তারা কারা? তারা ডলফিন। তারা তিমি মাছ। তারা জলহস্তি। তাদের সব কয়টা স্তন্যপায়ী। আমরাও স্তন্যপায়ী। আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখলাম যে, না, আমরা সমুদ্রে ফিরে যাব না। আমরা এটাকেই এক্সপ্লোর করব। তারা বলল যে, না, সমুদ্র বিশাল। তিন ভাগের দুই ভাগই আমাদের হাতে, আমরা সমুদ্রেই থেকে যাব। দুইটা ভাগে ভাগ হলাম আমরা। একটা খুব ক্রুশিয়াল মোমেন্টে একটা ভাগ উঠে আসলাম স্থলে। স্থলেই থেকে গেলাম। আরেকটা ভাগ, তারা কিন্তু সেইখানে ডেভেলপ করল। পরম সৌভাগ্য, আমাদের আঙুল গজাল। যে গ্রুপটার আঙুল গজাল সেই গ্রুপটা, আমরা, টেকনোলজিক্যালি ডেভেলপ করলাম। আমরা চলে গেলাম টেকনোলজিতে। তাদের আঙুল গজাল না। তাদের আঙুলের প্রয়োজন ছিল না। তাদের গজাল ব্রেইন। ওদের ব্রেইন তো আমাদের ব্রেইনের ডাবল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি প্রশ্নটা করছি, কাদেরটা ছিল বেটার ডিসিশন? আমাদের, না ওদের? আমরা বলব, আমাদের সিদ্ধান্ত বেটার। আমরা টেকনোলজি পেয়েছি। পুরো মহাবিশ্ব আমরা এক্সপ্লোর করছি। তারা বলবে, না, আমাদের সিদ্ধান্ত বেটার, আমাদের কোনো খাদ্যসমস্যা নেই, এবং আমরা ডেভেলপ করছি আমাদের চিন্তা। হয়তো তারা তাদের চিন্তার মাধ্যমে পুরো মহাবিশ্বকে এক্সপ্লোর করে ফেলেছে এর মধ্যে। আমরা টেকনোলজিতে এগিয়েছি ঠিকই, কিন্তু কোনো দিকে যেতে পারছি না। যাদের আমরা মনে করছি যে কিছুই না, জাস্ট মাছ, মাছ ছাড়া কিছুই না; দেখা গেল, তারা অনেক ওপরের লেভেলে আছে। কাজেই এখানে একটা সায়েন্স ফিকশনের উপাদান চলে আসছে। এটা নিয়ে আমি চিন্তা করছি এখন।

AMARBOI.COM

সাজ্জাদ : *আপনার উপন্যাসে দেখেছি, মানবেতর যে প্রাণ, তাদের প্রতি আপনার একধরনের প্রচণ্ড টান আছে। আপনি গাছ নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন* অন্যভুবন *। আপনার* পিপলী বেগম *পিঁপড়ের জগৎ নিয়ে। আপনি* পোকা *নামে বই লিখেছেন। এখন যে ধারণার কথা বলেছেন, জলচর প্রাণদের নিয়ে বা আপনার সায়েন্স ফিকশনের মধ্যেও দেখা যাবে, আপনি মানবেতর প্রাণের মধ্যে মানবিক জগৎ এক্সপ্লোর করেন।*

হুমায়ূন : আমি তো এইভাবে কখনো চিন্তা করিনি আসলে। গাছ আমাকে সব সময়ই আকর্ষণ করে। আমার মনে হয়, গাছের একটা ব্যাপার আছে, যা আমরা কোনো দিনই বুঝতে পারব না। একটা গাছ তিন হাজার বছর বেঁচে আছে, কত জ্ঞান সে আহরণ করেছে। সব পৃথিবীর যত গাছ আছে সবার সঙ্গেই সে জ্ঞানের লেনদেন করেছে। গাছটার ক্ষমতা তীব্র ক্ষমতা, বিশাল ক্ষমতা। আমরা তার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা, আমি খুব কনভিন্সড, আমরা একদিন গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব। যেদিন আমরা যোগাযোগ করতে পারব, আমরা যে বিষয়ে গবেষণা করছি জানার জন্য যে বৃষ্টিটা কী, তখন আমাদের তা আর চিন্তা করতে হবে না। কারণ, গাছেরা এর মধ্যেই সেটা জেনে গেছে।

রাইসু : *অন্য লেখকদের যেমন শুধু মানুষের ব্যাপার থাকে। আপনার এরিয়া তো আরও বড়।*

হুমায়ূন : এরিয়া নিয়ে আমি চিন্তা করি না। আমার মনে হয়েছে, যেসব জিনিস আমাকে আলোড়িত করে সেসব নিয়ে আমার লেখা উচিত।

রাইসু : *তার মানে আপনি উপন্যাস লেখেন কোনো একটা ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে চার্জড হয়ে, তারপর লিখতে লিখতে প্লট দাঁড় করান?*

হুমায়ূন : দুই রকমই হয়। মাঝে মাঝে কোনো একটা প্লট থাকে মাথার ভেতরে, তারপর লেখা শুরু করি। কোনো কোনো সময় জাস্ট লেখা শুরু করি। সাত-আট পৃষ্ঠা এগোনো যায়, লিখতে লিখতেই চরিত্রগুলো একসময় তৈরি হয়।

রাইসু : *আর চরিত্রগুলোকে তখন থামানো যায় না?*

হুমায়ূন : একপর্যায়ে চরিত্রগুলো আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাজ্জাদ : *আপনার দ্বন্দ্ব হয় না চরিত্রের সঙ্গে?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় প্রবল, যেমন, *কৃষ্ণপক্ষ*। আমার মধ্যে ছিল যে খুব হ্যাপি এন্ডিং দিয়ে একটা উপন্যাস আমি শেষ করব। উপন্যাস পড়ার একটা আনন্দ আছে তো। যে, এরা দুজন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। এই ভেবে আমি শুরু করেছিলাম। শুরু করার পর দেখা গেল যে চরিত্রটা অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাকে বাঁচিয়ে রাখা আর সম্ভব হলো না। বহু চেষ্টা করেছি তাকে বাঁচিয়ে

AMARBOI.COM

রাখার। অনেক অনেক চেষ্টা করেছি।

রাইসু : *যেসব চরিত্র বারবার আসে সেগুলো আপনার সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব শেষ হচ্ছে না বলেই বারবার আসছে?*

সাজ্জাদ : *যেমন হিমু।*

হুমায়ূন : হিমু নিয়ে মাথার মধ্যে আরেকটা লেখা আছে। হিমু আমার খুব একটা প্রিয় চরিত্র। হিমু অনেক কিছু করে, যেগুলো আমরা করতে চাই কিন্তু করতে পারি না। আমরা চাই যে, একটা জ্যোৎস্না রাত্রিতে সারা রাত বনের ভেতর বসে থাকব। জ্যোৎস্না দেখব, এটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা জানি, বাস্তবে এটা সম্ভব না। পোকায় কামড়াবে, পিঁপড়ায় ধরবে। সারা রাত আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে চাই। এ রকম আকাঙ্ক্ষা আমাদের আছে। আমাদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এগুলো পারছি না, কিন্তু আরেকজন পারছে, এবং নির্দ্বিধায় করছে। কোনো কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা নেই। এই লোকটি সর্ব চাপ থেকে মুক্ত, কাজেই সে আমাদের খুব প্রিয় চরিত্র। আমরা তার মতো হতে চাই না, কিন্তু আমাদের একটা অংশ আছে সে সব সময় এই লোকটির সঙ্গে থাকতে চায়।

সাজ্জাদ : *আপনার প্রায় সব উপন্যাসেই হিমু চরিত্রেরই কিছু কিছু অংশ কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে থাকে। মানে, একটা চরিত্র থাকে, যে কোনো কিছু মানতে চায় না। যা কেউ করতে পারে না, সে সেটা করে ফেলে।*

হুমায়ূন : মহান একজন ঔপন্যাসিক থেকে ব্যাখ্যা দিচ্ছি, তাঁর নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার অসম্ভব প্রিয়। এবং তাঁর যে কী পরিমাণ ক্ষমতা! তাঁর চরিত্র সৃষ্টির যে ক্ষমতা এবং মানুষের প্রতি তাঁর যে মমতা, এগুলো যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তা শেখার জন্য বিভূতিভূষণ পড়া দরকার। তাঁর উপন্যাস যখন পড়ি, আমি লক্ষ করি, তাঁর প্রত্যেকটি নায়ক আসলে অপু। আমি বলতে চাইছি যে, যখন একজন লেখক লিখতে শুরু করেন, নিজেকে নিয়েই তিনি লেখেন। আসলে অপুটা তিনি নিজে। যে উপন্যাসই তিনি লিখছেন, অপুই বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে। তাতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আমি খুব বড় লেখকের উদাহরণ দিলাম। এমনও হতে পারে যে, আমার নিজেরই এটা আছে, পুরোপুরি জানি না, অবচেতনে হয়তো আছে, এটাকে হয়তো বারবার আমার চোখের সামনে তুলে নিয়ে আসছি। প্রতিটি লেখক এক অর্থে ধর্মপ্রচারক।

সাজ্জাদ : *আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কী প্রচার করেন?*

হুমায়ূন : আমি প্রচার করি একটা জিনিস, খুব সচেতনভাবে করি। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ হয়ে এ পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কিছু নেই। মানুষ যে কী পরিমাণ ক্ষমতা রাখে!

AMARBOI.COM

সীমাহীন ক্ষমতা তার। সীমাহীন ক্ষমতা এই অর্থে যে, তার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। এত ক্ষমতা নিয়ে যে প্রাণীটি এসেছে তার সেই প্রচণ্ড ক্ষমতা, প্রচণ্ড মানসিক গুণ—এগুলো নিয়ে বারবার মানুষকে বলতে চাই যে, তোমরা মানুষেরা এই রকম প্রাণী।

সাজ্জাদ : *অন্য বিষয়, কোনো কোনো চরিত্রের প্রতি আপনি যতটুকু মনোযোগ দেওয়ার কথা ছিল সে মনোযোগ আপনি দেননি।*

রাইসু : *এটা একটা নিষ্ঠুরতা।*

হুমায়ূন : এই নিষ্ঠুরতা আগেও আমি অনুভব করেছি। আমাদের বিভূতিভূষণ কি দুর্গার প্রতি একটা নিষ্ঠুর উদাহরণ নয়? তাঁর এ অপরাধটা কখনো ক্ষমা করা যায় না। এত বড় একজন লেখক, তিনি কি এই মেয়েটাকে আরেকটু বড় করে দেখাতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন।

সাজ্জাদ : পথের পাঁচালী *লিখলে আপনি নিশ্চয়ই দুর্গাকে মারতেন না?*

হুমায়ূন : মারতাম। নয়তো নিজেই স্বস্তি পেতাম না। কিন্তু তার প্রতি আরেকটু মমতা দেখাতাম। মা যে ব্যবহারটা তার প্রতি করেছে, যে পক্ষপাতটা মা অপুর প্রতি করেছে, তা আমি করতাম না। এবং মায়ের এই পক্ষপাতিত্ব আনাটা অন্যায় হয়েছে। এ কারণে যে, মা জানেন দুই দিন পরই মেয়েটি চলে যাবে, এ অবস্থায় একটি মা কিন্তু এ রকম করে না; তখন অনেক বেশি আদর করে মেয়েকে। আমি হলে দেখাতাম, গভীর ভালোবাসায় মা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরেছে। যাকে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিতে হবে তাকে একটু মায়া-মমতা দেখাব না, এত নিষ্ঠুরতা আমার মধ্যে নেই।

রাইসু : *আপনি তো সাইকোলজিক্যালি চরিত্রগুলোকে আনেন। ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখেন। বর্ণনা আপনাকে বেশি দিতে হয় না। এটা কি নৈর্ব্যক্তিক থাকার চেষ্টা?*

হুমায়ূন : চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে আমার খারাপ লাগে না। সে অতটুকু লম্বা, তার গায়ের রং এই, তার চুলগুলো এই, তার চোখ এ রকম, চোখের এখানে একটা কাটা দাগ আছে, তার নিচের ঠোঁটটা চিকন, ওপরের ঠোঁটটা মোটা বেশির ভাগ লেখকের মধ্যেই এটা আছে। এতে হয় কি, তিনি বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর চোখে আমাকে দেখান। আমি সব সময় চাই আমার পাঠক চরিত্রগুলো নিয়ে নিজেরাই চিন্তা করুক।

রাইসু : *আপনি তো লেখায় সাইকোলজিক মানে সাইকোলজিক্যাল লজিক ব্যবহার করেন। এখন ধরেন আপনি একটা স্বাভাবিক ছেলে, মেয়েলি ছেলে না, তার মধ্যে মেয়েদের লজিক দিলেন। আপনার উপসন্যাস কি এগোবে?*

AMARBOI.COM

হুমায়ূন : উদ্ভটভাবে এগোবে। কারণ হচ্ছে কি, আমাদের ভেতর নানান ধরনের লজিক কাজ করে, আমরা একটা দিককে প্রাধান্য দিই। অন্য দিকগুলো, যেগুলোকে গুরুত্ব দিই না, কোনো বিশেষ সময় সমস্যায় সেগুলো চলে আসে।

সাজ্জাদ : *আচ্ছা, আপনাকে যদি এ রকম প্রশ্ন করা হয়, আপনি কোন উপন্যাসটা লিখতে পারলে খুশি হবেন? আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যেগুলো আছে, তার মধ্যে?*

হুমায়ূন : আমি খুব আনন্দিত হতে পারতাম যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* উপন্যাসটা লিখতে পারতাম।

সাজ্জাদ : *ধরা যাক আপনি একজন পাঠক, এখন হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের মধ্যে কী কী ত্রুটি আছে বলে আপনার মনে হয়?*

হুমায়ূন : খুব তাড়াহুড়ার একটা ভাব তার আছে। ইচ্ছা করলেই তিনি আরেকটু মনোযোগী হতে পারতেন। এ ছাড়া তিনি যে-জাতীয় সংলাপ লিখছেন, এ-জাতীয় এত ইন্টারেস্টিং সংলাপ আমরা সচরাচর দেখি না। এ কথা আমার প্রায়ই মনে হয় যে, তিনি জোর করে কোনো কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন কি না।

ভোরের কাগজ

AMARBOI.COM

২

'নিজের লেখা সম্পর্কে আমার অহংকার অনেক বেশি'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজ্জাদ শরিফ** ও **ব্রাত্য রাইসু**

হুমায়ূন আহমেদ : কী বলব?

ব্রাত্য রাইসু : *কিছু একটা বলুন।*

হুমায়ূন : কোন প্রসঙ্গে?

সাজ্জাদ শরিফ : *আপনার ফিল্ম প্রসঙ্গেই বলুন।*

হুমায়ূন : অনেক দিন থেকেই ছবি তৈরি করার একটা শখ ছিল আমার। আমাদের দেশে এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, এতগুলো মানুষ মারা গেল, স্বাধীন একটা

দেশ হলো, কেউ একটা ভালো ছবি বানাতে পারল না। এটি আমাকে সব সময় অসম্ভব রকম কষ্ট দিত। এরশাদ সরকার যখন ছবি তৈরির কথা ভাবল, তখন আমি ছবির চিত্রনাট্য তাদের দিতে চাইলাম, আমার মুক্তিযুদ্ধের একটি উপন্যাস—*১৯৭১*-এর। তারা সে ছবিটি করতে রাজি হলো না। বাংলাদেশ সরকার চাচ্ছিল এমন একটি ছবি, যেখানে এই মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারগুলো থাকবে না। এখানে অনেক বিতর্কিত ব্যাপার আছে, যেগুলো নিয়ে ছবি করার সাহস সম্ভবত সে সরকার অর্জন করতে পারেনি। যে কারণে আমাকে *শঙ্খনীল কারাগার*-এর চিত্রনাট্য দিতে হলো। এ ছবিটি বানাতে অনেক টাকাপয়সা লাগে। সে টাকাপয়সার জন্য অনেক ধনী ব্যক্তির কাছে হাত পেতেছি। আমি একা না, আমি তো ধনী মানুষদের বেশি চিনি না। ধনী মানুষদের চেনে আসাদুজ্জামান নূর। নূরকে সঙ্গে নিয়ে আমি এ দেশের অনেক ধনী লোকের কাছে গিয়েছি। কেউ টাকাপয়সা দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু আমি চিত্রনাট্য তৈরি করেছি প্রায় তিন বছর হলো। আমি কোনো ফিল্মমেকার না। গাদাগাদি ছবি তৈরি করব না। আমি একটিই ছবি বানাব। মুক্তিযুদ্ধের ছবি। একপর্যায়ে আমি একটি মিটিং করে আমার প্রকাশকদের বললাম আমার স্বপ্নের কথা। তাদের সাহায্য চাইলাম। আমার বিশ জন প্রকাশক আছে। তাদের বললাম, আপনারা ছবির প্রযোজক হয়ে যান। দুই লাখ টাকা করে আমাকে দেন। তারা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই প্রথম ভরসা পেলাম যে, না, ছবিটা আমি করতে পারব। টাকার অভাবে আমি আটকে থাকব না।

সাজ্জাদ : *আপনি তো প্রথমে ১৯৭১ উপন্যাসটি নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন, পরে তাহলে সেটা বাদ দিয়ে আগুনের পরশমণি নিয়ে করার কারণটা কী?*

হুমায়ূন : এর কারণটা *আগুনের পরশমণি*র পুরো ব্যাপার একটা ঘরের ভেতরে ঘটে। এতে আমার টাকাপয়সা অনেক কম লাগবে ছবিটি বানাতে। *১৯৭১*-এর যে বিশাল পটভূমি, তাতে আমার জন্য জিনিসটা অনেক ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। এবং অনেক জটিলও হয়ে যাবে।

সাজ্জাদ : *এবং একটা মিষ্টি প্রেমের ব্যাপারও আছে এতে, তাই না?*

হুমায়ূন : *আগুনের পরশমণি* মূলত একটি প্রেমের উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধটা সেখানে পটভূমি হিসেবে কাজ করছে।

রাইসু : *আপনার কি মনে হয়, যদি ১৯৭১ নিয়ে ছবি করতেন, তাহলে দর্শক একটু কম পেতেন।*

হুমায়ূন : দর্শক বেশি পেতাম কি কম পেতাম এটা কিন্তু আমার মাথার মধ্যে ছিল না। আমার মাথায় ছিল কোনটাতে টাকা কম লাগবে। আমার প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে অর্থ। কোনো ফিল্মমেকার যদি তাঁর পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করতে চান,

AMARBOI.COM

তাহলে আসলে তাঁর উচিত ১৯৭১ নিয়েই ছবি করা। আর আমার অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা তো একটা রয়েই গেছে।

রাইসু : *বড় পর্দায় আপনার ভীতি কী কী?*

হুমায়ূন : বড় পর্দায় আমার ভীতি তেমন কিছু নেই। আমি মানুষটা ছোটখাটো হলেও আমার সাহসের অভাব কোনোকালেই ছিল না। টেলিভিশন কিছুই না, আসল জিনিস হচ্ছে বড় পর্দা। ভীতির কথাবার্তা অনেকে বলেন, আমি তার কোনো রকম কারণ দেখি না। দুটোই ক্লোজআপ মিডিয়া। বড় পর্দার ডেপথ অব ফিল্ড অনেক বেশি। এ ব্যাপারটি ছোট পর্দায় নেই। বড় পর্দাটা ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাজ করে। টেলিভিশন ক্যামেরা ঘোরে ১৮০ ডিগ্রিতে।

রাইসু : *আপনার নাটক থেকে ছবিকে আলাদা করবেন কীভাবে?*

হুমায়ূন : নাটক থেকে ফিল্মকে আলাদা করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। আসলে তো এটা একটা শিল্পমাধ্যম। 'খাদক' নামে আমি একটি গল্প লিখলাম। এই গল্পকে আমি রূপান্তর করলাম টেলিভিশন পর্দায়। এই গল্পকেই আমি নিয়ে এলাম বড় পর্দায়। এই নিয়ে আসার ব্যাপারটি ঘটে যাচ্ছে সেখানে। এ ছাড়া বাকি যেগুলো সেগুলো তো টেকনিক্যাল ব্যাপার।

সাজ্জাদ : *কিন্তু আপনি যখন লিখছেন তখন কাজ করছেন ভাষা নিয়ে, যখন আপনি টিভিতে যাচ্ছেন আপনার চোখটা তখন অংশগ্রহণ করছে।*

হুমায়ূন : লেখার ব্যাপারে একটা সুবিধা হলো কি, আমি যখন লিখি, যাদের নিয়ে লিখছি ওদের আমি দেখাচ্ছি না। পাঠক একটা সুবিধা পাচ্ছে, সে নিজের মতো করে ওদের কল্পনা করতে পারছে। কিন্তু যখন ওদের আমি পর্দায় দেখাচ্ছি তখন পাঠককে সীমাবদ্ধ করে ফেলছি। আমি যে রকম জিনিসটাকে উপস্থিত করেছি, পাঠককে সে রকমই দেখতে হবে। এর বাইরে সে যেতে পারছে না।

সাজ্জাদ : *আপনার মিসির আলীকে নাটকে নিয়ে আসা উচিত হয়নি সে ক্ষেত্রে। আপনি তাকে খুন করেছেন।*

হুমায়ূন : হ্যাঁ। মিসির আলীকে নাটকে নিয়ে আসা একটা সমস্যার তৈরি করেছে। এটা মিসির আলি না হয়ে প্রফেসর শঙ্কু হয়ে গিয়েছে।

সাজ্জাদ : *লিখতে লিখতে হঠাৎ করে আপনার অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়ার প্রতি আগ্রহটা জন্ম নিল কেন?*

হুমায়ূন : '৭১-৭২ সালের কথা। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সময়কার ছাত্র। সে সময় আনিস সাবেত ছিল আমার বন্ধু।

সাজ্জাদ : *আপনারা তো পরিকল্পনা করেছিলেন যে বিয়ে করবেন না।*

হুমায়ূন : আমি, আনিস সাবেত এবং আহমদ ছফা আমাদের তিনজনের একটা

পরিকল্পনা ছিল যে আমরা বিয়েটিয়ে কিছুই করব না। আমরা সাহিত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করব। এদের মধ্যে আমি বিয়ে করে ফেলেছি।

রাইসু : *আর একজন বিয়ে করার সুযোগ পাননি।*

হুমায়ূন : আর একজন মারা গেলেন বিয়ে করার আগেই, আনিস সাবেত। ছফা ভাই এখনো করেননি। অবশ্য আনিস সাবেত বিয়ের বয়স পার করেই মারা গেছেন। আনিস সাবেতের ছবির প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ ছিল। সে সময়ে ছবির শর্ট কোর্স দেওয়া হতো, সেগুলো তিনি সব নিতেন। আমার কাছে টাকাপয়সা ছিল না। সেসব কোর্স নেওয়ার সংগতি আমার ছিল না। উনার আমার চেয়ে বেশি টাকাপয়সা ছিল, উনি টাকাপয়সা দিয়ে ওই কোর্সগুলো নিতেন। বইপত্র আনতেন। কোর্সের সময় অনেক রকম জিনিসপত্র সাপ্লাই করত, সেগুলো তিনি নিয়ে আসতেন। যেহেতু আমরা পাশাপাশি রুমে থাকি সে জন্য রাত ৯টা বা ১০টার পরে বসে বসে সব আলাপ-আলোচনা করতাম। আমরা ঠিক করতাম, কীভাবে ছবি বানাব। এই ছিল আমাদের সেই প্রথম যৌবনের কল্পনা। আনিস সাবেত যখন বিদেশে, কানাডায়, ছবি বানালেন একটা। আমাদের যে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল, তিনি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন। তিনি একটি শর্ট ফিল্ম বানালেন। ফিল্মটির নাম হচ্ছে *মন মোর মেঘের সঙ্গী*। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটি তিনি পিকচারাইজেশন করলেন। সেটি জার্মানির ফিল্ম ফেস্টিভালে অনারেবল মেনশন পেল। কাজেই আনিস সাবেত তার কথা রাখল। আর এই মিডিয়ার প্রতি আমার আগ্রহের কারণ হলো আমি দীর্ঘদিন টেলিভিশন নিয়ে কাজ করেছি। ওখানে দেখেছি অনেক সমস্যা আছে, অনেক মজার ব্যাপারও আছে।

সাজ্জাদ : *আপনি নাকি রাগারাগি করেন নাটক করার সময়?*

হুমায়ূন : না, রাগারাগি না। আমার বদনাম আছে যে আমি 'খুব' রাগারাগি করি। আসলে আমি খুব সফ্‌ট্‌।

সাজ্জাদ : *কোথাও হেঁটে যাচ্ছেন বা বসে আছেন তখন ভক্তদের নিয়ে নানা রকম ঝুটঝামেলা নিশ্চয়ই হয়। মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই বিরক্তিও লাগে। তখন আপনার রাগ হয় না, উল্টাপাল্টা কিছু করেন না?*

হুমায়ূন : রাগ আসে। রাগ এলে রাগটা চেপে রাখতে হবে, এ কথা মনে থাকে না আমার। রাগ এলে রাগটা চেপে রেখে একটা ভালো কিছু করতে হবে, আমার এ কথা মনে হয় না। আমি অবশ্যই রাগ করি।

রাইসু : *কীভাবে?*

হুমায়ূন : চিল্লাচিলি, হইচই করি। একটা ঘটনা বলি। আমরা টেকনাফ থেকে ফিরছি মাইক্রোবাসে। বাসটি প্রায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে। আমাদের

AMARBOI.COM

সামনে সামনে যাচ্ছে একটা পাজেরো। পাজেরো গাড়ি তো খুব দ্রুত স্পিড নিতে পারে, তো আমাদের চেয়ে বেশি স্পিডেই যাচ্ছে। আমরা নিরাপদ দূরত্ব রেখেই যাচ্ছি। হঠাৎ করে পাজেরো জিপটি রাস্তার মাঝখানে ব্রেক করে থেমে গেল। আমার ড্রাইভারের নিজের গাড়িটিকে থামাতে অসম্ভব রকম বেগ পেতে হলো। যেহেতু সে ছিল খুবই এক্সপার্ট একজন ড্রাইভার, সেহেতু গাড়িটা বাঁচাতে পারল। পাজেরো জিপের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা হলো সে এ রকম করল কেন। সে বলল, যা করছি, ঠিক করছি। আসল কারণ হচ্ছে ওই গাড়িটায় এক জাপানি ভদ্রলোক যাচ্ছিল। বড় কর্তাব্যক্তি একজন। সেই জাপানি কর্তাব্যক্তি রাস্তায় দেখতে পেয়েছে তার পরিচিত লোক, ড্রাইভারকে সে গাড়ি থামাতে বলেছে। আর ড্রাইভারের হয়েছে কি, এত্ত বড় একজন লোককে সে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, একটা মাইক্রোবাসের একজন লোককে তার পাত্তা দেওয়ার কী আছে! তো ড্রাইভার তখন উল্টাপাল্টা কথা বলছে। আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা চাচ্ছেন ঝামেলাটা চলে যাক। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছি। হঠাৎ মনে হলো, না, এটা তো হতে দেওয়া যায় না। কী হয়েছে আরোহী জাপানি বলে। আমি গাড়ি থেকে নেমে এলাম। তখন কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা। টেকনাফে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামার সময় কোমরে ব্যথা পেয়েছি। আমি বাঁকা হয়ে নেমে আসছি। হঠাৎ জাপানি দেখল, বাঁকা একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে আসছে। আমি তাকে বললাম, এই ড্রাইভারকে আমরা থানায় নিয়ে যাব। এই বদ ড্রাইভারকে। জাপানি ভদ্রলোক আমাকে বলার চেষ্টা করলেন, আমার তো কোনো দোষ নেই। শুরুতে পাত্তাই দিলেন না জাপানি ভদ্রলোক। তারপর আমি তাকে কঠিনভাবে বললাম, জানেন, মস্ত বড় মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল? এ লোকটি সেটি উপেক্ষা করেছে। সে দেখেছে যে এত স্পিডে একটি গাড়ি আসছে, তার পরও সে অশালীন ব্যবহার করছে। আমি একে ছাড়ব না। আমি একে ধরে নিয়ে যাব থানায়। এই সময় একদল ম্যাজিস্ট্রেট যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট হলে তো হুমায়ূন আহমেদকে চেনার কথা। অবস্থা তখন নিতান্তই নাকি জোরালো। আমি তো কিছুতেই ছাড়ব না। জাপানিকে সুদ্ধ ধরে নিয়ে যাব থানায়।

রাইসু : *আপনি বারবার থানায় যেতে চান কেন?*

হুমায়ূন : কারণ আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে, ওরা দেখবে। আমি যদি ধরে মার দিই, তো চিল্লাবে...।

সাজ্জাদ : *অনেক পাগলামি আছে আপনার মধ্যে।*

হুমায়ূন : না, পাগলামি ঠিক না। যেকোনো লোকই এ পরিস্থিতিতে এ রকম করবে।

রাইসু : *সাহিত্যের কোনো ব্যক্তিত্ব দিয়ে কি আপনি মোহাবিষ্ট বা তাঁর মতো হওয়ার কোনো ইচ্ছা আছে?*

হুমায়ূন : কেউ তো কারও মতো হতে পারে না। একজন হুমায়ূন আহমেদ হুমায়ূন আহমেদই থাকেন। একজন হুমায়ূন আহমেদ কখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন না।

রাইসু : *না, ব্যক্তিজীবনের কথা বলছি।*

হুমায়ূন : ব্যক্তিজীবনে? এসব বড় বড় লেখকের ব্যক্তিজীবন সব সময় যে খুব আকর্ষণীয়, তা কিন্তু না।

রাইসু : *যেমন ধরুন রবীন্দ্রনাথ ঘুরছেন বেশ, নৌকায় করে।*

হুমায়ূন : রবীন্দ্রনাথের এই অংশগুলো আমাকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে তো বটেই। যে কারণে *অয়োময়*-এর মির্জা বজরাতে ঘুরে বেড়াত। কী জন্য? কারণ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথেরও বজরা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন জমিদার। *অয়োময়*-এর জমিদার চরিত্রটা তৈরি করার সময় আমার মাথায় ছিল শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ।

রাইসু : *আচ্ছা, আপনার প্রথম দিককার উপন্যাসের সঙ্গে এখনকার উপন্যাসের তো একটা পার্থক্য হয়েছে। এটা কী রকম?*

সাজ্জাদ : নবনী *থেকে আপনার লেখা নতুন একটা বাঁক নেওয়া শুরু করেছে। জীবনের কুৎসিত দিক এখন আসছে প্রবলভাবে।*

হুমায়ূন : আনতাম না হয়তো বলাটা ঠিক না। *নন্দিত নরক*-এ তো ছিল।

সাজ্জাদ : *আপনি পরোক্ষভাবে আনতেন।*

রাইসু : *আমার মনে হয় সবচেয়ে সাহসীভাবে* নন্দিত নরকে-*ই ছিল।*

সাজ্জাদ : *এবার যে বইগুলো বেরিয়েছে সেগুলোর মধ্যে* যখন গিয়েছে ডুবে পূর্ণিমার চাঁদ-*এর কথা ধরা যাক। একটা চরিত্র আছে যে মর্বিড একটা চিন্তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পুরো উপন্যাসে। পড়ে মনে হয়েছে, লিখতে গিয়ে আপনি নিজে সাফার করছেন। কারণ এতে আপনি অভ্যস্ত নন। সে জন্য একদম শেষে ওর বাবার চরিত্রটা আসছে। আসলে বাবার চরিত্রটা এনে আপনি নিজে একটু রেহাই পেলেন।*

হুমায়ূন : আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, মর্বিডিটি মানুষের অর্জিত একটা ব্যাপার। জন্মগতভাবে মানুষ মর্বিড না। একটা মানুষকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মর্বিড দেখানোর আমি পক্ষপাতী না। আমি মনে করি, শুদ্ধতম চেতনা নিয়ে আমরা পৃথিবীতে এসেছি। যেসব মর্বিডিটি আমরা পাচ্ছি, সেগুলো আমরা সঞ্চয় করেছি। আমাদের মধ্যে সেগুলো দিয়ে পাঠানো হয়নি। যে জিন নিয়ে আমরা এসেছি তার মধ্যে কোনো মর্বিডিটি ছিল না।

AMARBOI.COM

সাজ্জাদ : *তরুণেরা পড়ছে, তাদের ওপর প্রভাব পড়ছে আপনার। আপনি কি দায়িত্ব অনুভব করেন না যে আপনার কলমের ওপর তরুণ প্রজন্মের রুচি নির্ভর করছে? চাপ অনুভব করেন না লিখতে গিয়ে?*

হুমায়ূন : লেখাটা কীভাবে তৈরি হয় আমি সেটার ব্যাখ্যা করতে পারব না। তৈরি হওয়ার পদ্ধতিটি আমি নিজেও পরিষ্কারভাবে জানি না। একটা লেখা যখন আমার মধ্যে আসে তখন মাথাজুড়ে ওই লেখাটাই থাকে। আর কিছুই থাকে না। শয়নে স্বপনে ওই লেখাটাই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। যখন লেখাটা বের হয়ে চলে যায় তখন মনে হয়, মাথার ওপর যেন কেউ বড় একটা পাথর চাপিয়ে রেখেছিল, পাথরটা সরে গেল। আমার লেখালেখির ধরনটা হলো কীভাবে পাথরটা সরিয়ে ফেলা যায়। এই পাথরটা সরানোর দিকেই আমার নজর থাকে বেশি। কে এটা নিয়ে কী ভাবছে, কোনো সমালোচক এটা নিয়ে কী বলবে, কে আমাকে ধুয়ে ফেলবে, কে বলবে এটা বাজে হয়েছে—এটা মাথার মধ্যে থাকে না।

রাইসু : *কারও কথা মাথায় রেখে কি লেখেন?*

হুমায়ূন : না, নিজের দিকে তাকিয়ে লিখি।

সাজ্জাদ : *চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান না?*

হুমায়ূন : পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যাই বলে মনে করি।

সাজ্জাদ : *তাহলে যে চরিত্রগুলো মেরে ফেলেন, তাদের জন্য খারাপ লাগে না?*

হুমায়ূন : খারাপ লাগে তো বটেই। অনেক সময়েই খারাপ লাগে। *কুসুম* বলে একটা নাটক হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমি লিখি। নাটকটি যখন রেকর্ডিং হয় তখন আমার চোখে এতই প্রবল পানি আসে যে ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, হুমায়ূন আহমেদকে সরিয়ে নিয়ে যাও। খুব খারাপ লাগছিল। এটা হয় চরিত্রগুলোর প্রতি একাত্মতার কারণে। এটা শুধু আমার একার হয় না, আমি মনে করি সবারই হয়।

সাজ্জাদ : *লেখার সময় তো বুঝতে পারেন যে চরিত্রটার নিয়তি এমন হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে তখন আপনি তার নিয়তি বদলে দিতে পারেন। কারণ আপনার হাতে কলমটা আছে। এ রকম আবেগময় মুহূর্তে আপনাকে নিজের বিরুদ্ধে নিজের লড়তে হচ্ছে। আপনার একটা আবেগের সঙ্গে আরেকটা আবেগ লড়াই করছে তখন।*

হুমায়ূন : বলা হয়ে থাকে যে লেখকদের হাতে যেহেতু কলম থাকে, লেখক যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। আসলে লেখক যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন না। ঘটনা যখন দাঁড়িয়ে যায়, চরিত্র যখন তৈরি হয়ে যায়, তখন ওদের একটা নিজস্ব জীবন এসে যায়। ওরা নিজেদের নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করে। আমার কোনো কিছু করার থাকে

AMARBOI.COM

না। ইচ্ছা থাকলেও আমি পারি না।

রাইসু : *অনেক উপন্যাস তো আপনি লিখেছেন। একেকটা চরিত্রের একেকটা জগৎ আছে আপনার কাছে। এদের প্রত্যেকের জগৎই কি আপনি অনুভব করতে পারেন?*

হুমায়ূন : না, কিছু কিছু আছে যেগুলো অনুভব করতে পারি না। সেগুলো লিখতেই বেশি আনন্দ পাই। যেমন সায়েন্স ফিকশনে অনুভব করতে পারি না। সায়েন্স ফিকশনের জগৎটি কল্পনার। সেটি এই পৃথিবীর জগৎ দিয়ে অনুভব করতে পারি না। কল্পনা দিয়ে সেটিকে ছোঁয়া হয়। অনেক বেশি আকর্ষণীয় সেটি। সেখানে আমি অনেক বেশি স্বাধীনতা পাই। সেখানে আমি আমার কল্পনাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারি।

রাইসু : *সায়েন্স ফিকশনে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে কে?*

হুমায়ূন : বিজ্ঞান। কোনো কোনো সময় কল্পনাও নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা মনে করি যে বিজ্ঞান বোধহয় কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং বিজ্ঞানই কল্পনাকে মুক্তি দেয়। রূপকথা লেখার যে আনন্দ আছে, আমার মনে হয় একজন সায়েন্স ফিকশন লেখক সে আনন্দটা পান।

সাজ্জাদ : *সায়েন্স ফিকশন তো আধুনিক সময়ের রূপকথা।*

হুমায়ূন : বলা যেতে পারে একটি আধুনিক, অত্যন্ত আধুনিক রূপকথা। যে রূপকথা রূপকথা নাও হতে পারে। আমরা জানি, দৈত্যের প্রাণ কখনোই ভোমরার ভেতর থাকবে না। কিন্তু সায়েন্স ফিকশনের যে দৈত্য আমরা পাই তার প্রাণ যদি ভোমরার মধ্যে থাকে, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে এটা সম্ভব।

সাজ্জাদ : *আপনার নিজের তৈরি কোনো চরিত্রের মতো হওয়ার চেষ্টা করেন না?*

হুমায়ূন : খুব সচেতনভাবে এটা নিয়ে চিন্তা করিনি। এখন মনে হচ্ছে, আমার মনে হয় না সে রকম। বরং যখন দেখি এই চরিত্রগুলোর দ্বারা কেউ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তখন আমার হাসিই পায়। কোনো ছেলে যদি রাত্রিবেলা এসে বলে যে আমি হিমু, আমার কাছে মনে হয় এ ছেলেগুলো এ রকম করছে কেন?

রাইসু : *তাদের মধ্যে এ রকম একটা ব্যাপার হয়তো আগেই ছিল। আপনি তাদের শুধু ধরিয়ে দিলেন।*

হুমায়ূন : হয়তো আমাদের সবার মধ্যে একটা করে হিমু আছে।

রাইসু : *আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? অবশ্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ওইভাবে জিজ্ঞাসা করাও উচিত না। কারণ আপনার ভবিষ্যৎ তো আর অত ক্ষুদ্র না। আরও অনেক দিন তো আপনি বাঁচবেন।*

হুমায়ূন : আমার ভবিষ্যৎ তো আর আমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না। আমরা ভবিষ্যতেও

AMARBOI.COM

বাস করি না, অতীতেও বাস করি না। আমরা বর্তমানে বাস করি। আমি মনে করি, আমি বাস করি বর্তমানে।

রাইসু : *বলা যায়, আমরা বর্তমানে বাস করে থাকি।*

হুমায়ূন : আমার প্রতিটি মুহূর্তই বর্তমান। আমার জীবিত জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত নেই যে মুহূর্ত অতীত বা ভবিষ্যৎ।

সাজ্জাদ : *নিজের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগগুলো বলুন?*

হুমায়ূন : আমার লেখার বিরুদ্ধে?

সাজ্জাদ : *আপনার লেখার বিরুদ্ধে, আপনার নিজের বিরুদ্ধে?*

হুমায়ূন : কিছু কিছু লেখাতে, আমি জানি, যদি আরেকটু সময় দিই, আরেকটু বেশি চিন্তা করি, আরেকটু ঠান্ডা মাথায় লিখি, খুব সুন্দর করে আমি শেষ করতে পারি। এমনও না যে সে সময়টুকু আমার নেই। এমন না যে আমার ইচ্ছার অভাব আছে। কিন্তু আমার সময়টুকু দিতে ইচ্ছা করে না। একধরনের অস্থিরতা অনুভব করি। একধরনের চাপ বোধ করি। পাথরের চাপটা বোধ করি। এবং দ্রুত শেষ করে ফেলি। একবার শেষ করে ফেলার পর মনে হয়, এটা কী করলাম?

সাজ্জাদ : *এ জন্যই কি কোনো কোনো চরিত্রকে আপনি পরে আরেকটা উপন্যাসে নিয়ে আসেন?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, কাহিনিটা হয়তো পুরোটা বলা শেষ হয়নি, তখন আমার বলতে ইচ্ছা করে। একটা চরিত্রের জন্য একটা উপন্যাস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটা চরিত্রের জন্য চৌদ্দটা উপন্যাস হওয়ার কোনো মানে নেই। কিন্তু একটা চরিত্রের জন্য আমার চৌদ্দটা উপন্যাসই লিখতে ইচ্ছা করে। আমি যদি ঠিকঠাকমতো একটি হিমু লিখতে পারতাম, তাহলে চারটা-ছয়টা হিমু লিখতে হতো না। নিজের লেখা সম্পর্কে আরেকটা ব্যাপার আমাকে কষ্ট দেয়। সেটি হলো, একটা লেখা লেখার জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতি আমার থাকা দরকার, যে পরিমাণ পড়াশোনা নিয়ে আমার একটা লেখা লিখতে যাওয়া উচিত, ওই জায়গাটা আমি অবহেলা করি। আমি মনে করি, এটার দরকার নেই। হঠাৎ করে মনে হলো আর লেখা শুরু করলাম। কোনো রকম চিন্তাভাবনা নেই, কোনো রকম পরিকল্পনা নেই, কিছু নেই। ব্যস, লিখতে বসে গেলাম। যদি একটু পরিকল্পনা থাকত, তাহলে অনেক ভালো হতো।

সাজ্জাদ : *অনেকেরই অভিযোগ, আপনি নাক-উঁচু।*

হুমায়ূন : আমি অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারি না। একটা দূরত্ব বোধ করি। নিতান্ত পরিচিত মনে না হলে তাদের সঙ্গে রসিকতাও করি না। আমার রসিকতা সীমাবদ্ধ থাকে আমার অতি প্রিয়জনদের জন্য। বাইরের লোকেরা আমার এই রসিকতার অংশটুকু জানে না। আর দ্বিতীয়টি হতে পারে

AMARBOI.COM

ইউনিভার্সিটিতে আমি মাস্টারি করি। সেখানে শুরু থেকেই যদি আমাকে ঔপন্যাসিক মনে করে নেয়, ধরে নেয় যে তার সঙ্গে ঠাট্টা-ফাজলামি করা যাবে, নাটক নিয়ে আলাপ করা যাবে, তাহলে তো সমস্যা। আমি জটিল বিষয় পড়াই, কোয়ান্টাম মেকানিক্স্। অমন হলে তো জটিল বিষয়ে যেতে পারব না। আমি তাই গোড়া থেকেই অসম্ভব রকম সাবধান। ছাত্ররা আমাকে যমের মতো ভয় পায়। এসব কারণেই মনে হয়। তা ছাড়া পরিবারের বড় ছেলে। ছোটবেলা থেকেই বড় ছেলেদের মাথার মধ্যে থাকে যে তাদের ছোট ছোট ভাইবোন আছে। তাকে গম্ভীর হয়ে যেতে হয়। সবকিছু মিলে আমার ভেতরে নাক-উঁচু ভাব আছে বলে আমি মনে করি না। তবে নিজের লেখা সম্পর্কে আমার অহংকার অনেক বেশি।

সাজ্জাদ : *আপনি তো সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না?*

হুমায়ূন : যে পড়ে সমালোচনা করে তার সমালোচনা, কষ্ট লাগলেও, অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করি।

ভোরের কাগজ

AMARBOI.COM

৩

'আমি এক অর্থে নিয়তিবাদী'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **নাসির আলী মামুন**

নাসির আলী মামুন : *বেশ কয়েক বছর আগে আপনি একটা মন্তব্য করছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাদেশের একজন লেখিকা সবচেয়ে বেশি প্রচার পাইছেন। আবার অনেকে বলে দুই বাংলায় রবীন্দ্রনাথের পরে আপনার লেখাই প্রচার পাইছে বেশি—*

হুমায়ূন আহমেদ : এটা কেউ বলে থাকলে আমার প্রতি প্রচণ্ড মমতা এবং ভালোবাসা থেকে বলেছেন। ওই লাইনে যেতে চাচ্ছি না। তবে আমাদের একজন লেখিকা পশ্চিমা মিডিয়াতে অনেক প্রচার পেয়েছেন, তা সত্য। আমাদের কালচার ও ধর্মকে খাটো করে কেউ লেখালেখি করলে তাকে নিয়ে পশ্চিমারা মাতামাতি করতে পছন্দ করে। সেই সূত্রে তিনি প্রচারটা পেয়েছেন। আজ যদি আমিও ওই

কাজ করি, ওই প্রচারটা আমিও পাব। আমি পারিনি। উনি হয়তো পেরেছেন।

নাসির : *আপনি তো নিশ্চয়ই চান, আপনার বই কেউ অনুবাদ করুক।*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, চাই।

নাসির : *আপনার বই কয়টা ভাষায় অনুবাদ হইছে?*

হুমায়ূন : হয়েছে কয়েকটা।

নাসির : *বাংলাদেশের প্রায় সব পুরস্কার আপনি পাইছেন।*

হুমায়ূন : সেটা বলা যেতে পারে।

নাসির : *অনেক লেখকের মধ্যে ব্যাকুলতা থাকে, কারোটা প্রকাশ পায় কারোটা পায় না। নোবেল পুরস্কার বা এরকম কিছু নিয়ে আপনার কোনো ব্যাকুলতা আছে?*

হুমায়ূন : গল্প করার সময় ফান করে অনেক সময় বলি যে, আমি সমস্ত লেখালেখি করি পুরস্কারের জন্য। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এটা সত্যি যে, পুরস্কার নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। পত্রিকায় দেওয়া ইন্টারভিউতেও কিন্তু বলি পুরস্কার বা পয়সার জন্য লিখি। পয়সার জন্য যদি লিখতাম, তবে অনুবাদ করতাম। আসলে আমার জন্য যেটা নির্ধারিত—আই উইল গেট ইট। আমি এক অর্থে নিয়তিবাদী।

নাসির : *নিয়তিবাদীরা তো এভাবে কাজ করতে পারে না।*

হুমায়ূন : কাজ করা যায় না আসলে। নিয়তির হাতে সব ছেড়েছুড়ে দিই। এতেও আনন্দ আছে।

নাসির : *এই যে হাজার-হাজার লাখ-লাখ পাঠক আপনার, ছেলেমেয়ে, বুড়াবুড়ি—এরা আপনার নামে এত পাগল কেন? দুই বাংলায় আরও তো লেখক আছে।*

হুমায়ূন : আমি আসলে বুঝতে পারি না। আমার নাটকে বাকের ভাইকে ফাঁসি থেকে বাঁচানোর জন্য যখন মিটিং, মিছিল, অনশন হলো তখনই প্রথম জিনিসটা স্ট্রাইক করল। একজন বিদেশি এই প্রসঙ্গে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, এটা কোত্থেকে আসল। সাইকোলজিস্টরা এটা ভালো বলতে পারবেন। আমি বলতে পারছি না।

নাসির : *বাংলা একাডেমীর বইমেলায় বা অন্য জায়গায় আপনি পাঠক-ভক্তদের সরাসরি অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় নাম জিজ্ঞেস করেন, কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গে কথাও হয়। তখনো কি বোঝেন না, কী কারণে তারা ওই বই কেনে?*

হুমায়ূন : আমি বুঝি না। বুঝতে চাইও না।

নাসির : *আপনার লেখার ভাষার সহজ-সরল আর এমনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন যে মানুষের পড়তেই হয়।*

হুমায়ূন : হতে পারে।

AMARBOI.COM

নাসির : *আপনার নাটকও তাই। নাটক লেখার সময় কি মাথায় থাকে যে এ চরিত্রটা নূর ভাইকে দিয়ে করাবেন বা এটা জাহিদ হাসানকে?*

হুমায়ূন : শুরুতে যখন লিখতাম, টেলিভিশন যখন নাটক বানাত, তারাই ঠিক করত কে অভিনয় করবে। এখন যখন নিজেই নাটক বানাই, নিজেকেই আর্টিস্ট খুঁজে বের করতে হয়, তখন তো মোটামুটিভাবে মাথায় থাকেই।

নাসির : *আপনে নিজে অভিনয় করেন না কেন?*

হুমায়ূন : আমি অভিনয় পারি না। পারলেও করতাম না। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা অতি কঠিন বিদ্যা। যখনই কেউ আমার মুখের সামনে ক্যামেরা ধরে, তখন আমার সমস্ত মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায়। আমার স্বর বন্ধ হয়ে যায়; তখন যে দৃষ্টিতে তাকাই সেটা মোটামুটি উন্মাদের দৃষ্টি। আমার পক্ষে উন্মাদের অভিনয় ছাড়া অন্য কোনো অভিনয় সম্ভব না।

নাসির : *অনেকে বলে বাঙালি পাঠকের মন হুমায়ূন আহমেদ খুব ভালোভাবে ধরতে পারছেন। কথাটা কি ঠিক?*

হুমায়ূন : কথাটাকে হাস্যকর মনে হয়। নার্ভ বোঝার তো কিছু নাই। আমি উল্টোভাবে বলতে পারি, পাঠকরা আমার নার্ভটা ধরতে পারছে। এত এত পাঠকের নার্ভ তো ধরা সম্ভব না। আমারটা ধরা অনেক সহজ।

নাসির : *একসময় নাকি আপনে প্রকাশকদের দ্বারে ঘুরছেন? পরে যখন আপনার বই চলা শুরু হইল তখন আপনে নাকি প্রকাশকদের সাথে ইনটেনশনালি এবং ডিপ্লোম্যাটিক্যালি একধরনের শীতল ব্যবহার করতেন?*

হুমায়ূন : এটা একেবারেই সত্যি কথা নয়। কথা হচ্ছে কি, আমি তো খুবই লাজুক ধরনের মানুষ। কখনোই কোনো পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনো প্রকাশকের কাছে যাইনি। এই কাজটা করেছেন আহমদ ছফা। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। আমার যেন একটা লেখা ছাপা হয়, সে জন্য বগলে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছেন প্রকাশকদের কাছে। ওদেরকে রাজি করিয়ে উনি যখন বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন তখন একদিন ভয়ে ভয়ে গেছি। আমার অসীম সৌভাগ্য যে, কখনোই আমাকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনো প্রকাশকের কাছে যেতে হয়নি। যখন ছাপা হয়ে গেছে, তখন তারাই এসেছে। আমি মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করি না। প্রকাশকদের সঙ্গে তো প্রশ্নই আসে না।

নাসির : *লেখালেখি করে বছরে আয় কত হয়? আপনি কি ইনকাম ট্যাক্স দেন?*

হুমায়ূন : অবশ্যই আমি ইনকাম ট্যাক্স দিই এবং বছরে ৬-৭ লাখ টাকা তো বটেই, কমপক্ষে।

নাসির : *কোন বছর থেকে দিচ্ছেন?*

AMARBOI.COM

হুমায়ূন : অনেক দিন। আমার সার্কেলে আমি সর্বোচ্চ দিই। আমার উকিল তো তা-ই বলে।

নাসির : *পশ্চিম বাংলায় আপনার পাঠক কেমন?*

হুমায়ূন : পাঠক তো ভালো হওয়ার কথা। সেখানে বইমেলা যখন হয়, আমি যাই না কখনো, প্রকাশকরা বই-টই বিক্রি করে খুব আনন্দিত থাকে। তখন মনে হয় ভালো। অনেক দিন ধরে *দেশ* পত্রিকায় লিখছি তো। পরিচিতিটা হয়েছে।

নাসির : *পাঠকও বাড়ছে?*

হুমায়ূন : নিশ্চিত যে বাড়ছে?

নাসির : *পশ্চিম বাংলায় নাটক লেখার তাগিদ পান?*

হুমায়ূন : এখনো পাইনি। তবে সমরেশ মজুমদার মাঝে মাঝে বলেন, মিসির আলী নিয়ে নাটক করতে চায়। মুখে বলা পর্যন্তই, এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। মাঝে মাঝে আসে, শুভ্র উপন্যাসটার সিরিয়াল করতে চায়, কথাবার্তা পর্যন্তই এসব সীমাবদ্ধ থাকে। হয়তো আমাকে খুঁজে পায়নি। কথাবার্তা কখনোই ম্যাটেরিয়েলিস্ট হয় না।

নাসির : *লেখালেখি কখন করেন? অনেকের নির্দিষ্ট সময় থাকে। এস এম সুলতান যেমন বলতেন গোধূলি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। ওই সময় তিনি কোনো দিন ছবি আঁকতেন না।*

হুমায়ূন : আমার কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। তবে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দু-তিন কাপ চা খেয়ে আমি অবশ্যই লিখতে বসি। প্রতিদিন। যখন কোনো কাজ থাকে না তখনো বসি। এরপরে যখনই লিখতে ইচ্ছে করে লিখি।

নাসির : *বাংলা একাডেমীর বইমেলার সময় লেখালেখি করেন?*

হুমায়ূন : না।

নাসির : *তার মানে লেখালেখির কাজটা করেন বছরে ১১ মাস? শোনা যায় আপনি একই দিনে বা একই সময়ে দু-তিনটা লেখা লেখেন!*

হুমায়ূন : একসময় লিখতাম। এটাকে আমি বড় ব্যাপার বলে মনে করি না। অনেকেই পারে। একজন পেইন্টার একসঙ্গে অনেক ছবি আঁকতে পারে। ব্রেইনের ফিল্ড তো অনেক বিশাল।

নাসির : *আপনে তো কলম দিয়ে হাতে লেখেন। আপনে একজন বিজ্ঞানী। আপনে কম্পিউটার ব্যবহার করেন না কেন?*

হুমায়ূন : আগে ব্যবহার করতাম। করে দেখলাম, আমার চিন্তার স্পিড টাইপের চেয়ে দ্রুত। আমি যখন ১ নম্বর লাইন লিখছি, তখন আমার ব্রেইন চিন্তা করছে ১৩ নম্বর লাইনটা। তা ছাড়া কম্পিউটারে লেখার ইতিহাসটা থাকে না, কারণ মুছে ফেলা যায়। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে ইরেজ করা লাইনও থাকে—স্টোরি অব রাইটিং।

AMARBOI.COM

কেন কাটলাম, এগুলো পাণ্ডুলিপিতে থাকে।

নাসির : *আপনার পাঠক-ভক্তরা চিঠি লেখে আপনাকে?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ।

নাসির : *কোনো সময় হাতে লিখে উত্তর দেন?*

হুমায়ূন : একসময় দিতাম। এখন একজন লোক রেখেছি। সে প্রতিটা চিঠি পড়ে জবাব দেয়। সইটা আমি করি।

নাসির : *আপনার ভক্তরা কী লেখে?*

হুমায়ূন : তারা এখন চিঠি লেখার চেয়ে ফোনে কথা বলতে চায় বেশি।

নাসির : *ফোনে কী বলে?*

হুমায়ূন : অনেক কিছু। একবার এক তরুণী বলল, আপনার সঙ্গে নুহাশ পল্লীতে জ্যোৎস্না দেখব। আমি বুঝতে পারি, তারা কেন এসব বলে!

নাসির : *কেন বলে?*

হুমায়ূন : হোহ্ হো হোহ্ হো...।

নাসির : *নির্দিষ্ট কোনো সময় বসেন অফিসে?*

হুমায়ূন : না।

নাসির : *নতুন কী লেখতেছেন?*

হুমায়ূন : নাটকের গান লিখলাম একটা গতকাল। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের জন্য লিখতে খুব ইচ্ছে হয়। লিখেছিও। একটা উপন্যাস লিখছি। ২৫-৩০ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে।

নাসির : *কী নিয়ে?*

হুমায়ূন : একটা ছেলে ছবি আঁকবে। তার জন্য টিচার ঠিক করা হলো। ওই টিচারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিয়ে লিখছি। মজার আছে। ছেলেটির বাবা-মায়ের ডির্ভোস হয়ে গেছে। বাবা আলাদা থাকে, মা আরেক ভদ্রলোককে বিয়ে করে। ছেলেটা আইসলেটেড। টিচারের সঙ্গে সম্পর্কটা আগাচ্ছে।

নাসির : *আর কত দিন ফিল্ম করবেন? কয়টা করবেন পরিকল্পনা আছে?*

হুমায়ূন : না।

নাসির : *দুঃখ-বেদনা-নিঃসঙ্গতা থেকে আত্মহত্যা করে লেখক-শিল্পীরা। আপনি কি মনে করেন আপনি নিঃসঙ্গ? ছেলেমেয়েরা কাছে আসে না?*

হুমায়ূন : সব মানুষের বেদনা হলো পার্ট অব লাইফ। যে মানুষটি স্ত্রী-বাচ্চাসহ জীবন শুরু করে, তার একটা পর্যায় আসে, যখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যায়, তারা বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায়; স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আছে। স্ত্রী মারা গেল। একটা সময় নিঃসঙ্গতা থাকে। যার জন্য আমাদের বলা হচ্ছিল—বয়স হলে একটা জঙ্গলে

AMARBOI.COM

চলে যাও। বাংলাদেশে তো আর সুযোগটা নাই। তাই অনেকেই, বা আমি নিজেই নিজের বেদনা খুঁজে নিয়েছি, এটা বললে কেমন হয়?

নাসির : *কী কারণে?*

হুমায়ূন : নানান কারণ থাকে। মানুষ হিসেবে আমার কিছু ফেইলিওর আছে। এগুলো হয়তো অনেক বড় ধরনের ছিল। সেই জন্য পরিবারের সঙ্গে একত্রে বাস করা সম্ভব ছিল না বা তারা পছন্দ করে নাই। আমার নিজের ফেইলিওর নিয়ে জোর করে এক জায়গায় বাস করাটা খারাপ লেগেছে আমার কাছে।

নাসির : *ছেলেমেয়েরা যোগাযোগ করে?*

হুমায়ূন : একটা মেয়ে তো দেশের বাইরে চলে গেছে। নোভা। ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। কম্পিউটার সায়েন্সে। এখন পিএইচডি করছে। আর বাকি যারা আছে যোগাযোগ রাখছে। নুহাশ তো বাবার খুব ভক্ত। অকেশনে আসে।

নাসির : *ছবি আঁকা শুরু করছেন কবে?*

হুমায়ূন : আসলে ছবি আঁকার ব্যাপারটা আমার পারিবারিকভাবে আছে। জাফর ইকবাল কার্টুন আঁকত। আহসান হাবীব তো কার্টুন করেই। ছবি আঁকা আরম্ভ করলাম প্রায় আড়াই বছর।

নাসির : *আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে তো কেউ আর্টিস্ট ছিল না।*

হুমায়ূন : না। চিত্রশিল্পী নাই, লেখক নাই, কবি নাই। মওলানা আছে—দাদা মওলানা। তার দাদাও মওলানা—মওলানা গোষ্ঠী।

নাসির : *ছবি আঁকা শুরু হয় কবে?*

হুমায়ূন : পোলাপাইন্যা বয়সে। স্কুল ম্যাগাজিনে আঁকার দায়িত্ব কিন্তু আমার। চিটাগাং কলেজের স্কুল। সিক্স-সেভেনে।

নাসির : *মাঝে তো বাদ গেছে। এখন তো মনে হয় সিরিয়াস।*

হুমায়ূন : না, সিরিয়াস কোথায়?

নাসির : *ছবিতে স্বাক্ষর দেন না কেন?*

হুমায়ূন : স্বাক্ষর দেওয়ার মতো ভালো ছবি আঁকা হয়নি। ভালো হলে এমনিই স্বাক্ষর দেব। এখন যা আঁকছি, তাতে স্বাক্ষর দিলে লোকে আদর করে নিয়ে যাবে নামটার কারণে। ছবির কারণে না।

নাসির : *তাহলে যে পেইন্টিংগুলো আঁকতেছেন, এগুলো শিখতেছেন?*

হুমায়ূন : এমনিই। আমার ঘর ভর্তি হলো ছবি আঁকার বই। আমার অনেক টিচারও আছে। যেমন অমুককে খবর দিয়ে নিয়ে আসি। আমার ছবির যিনি আর্ট ডাইরেক্টর উনি একজন পেইন্টার। মহিউদ্দিন ফারুক। উনি শেখান।

নাসির : *আপনার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই? কম্পিটিশন করা বা এক্সিবিশন?*

AMARBOI.COM

হুমায়ূন : না। জাস্ট আমার শখ। ভাল্লাগে। খুবই আজেবাজে ছবি যখন সুন্দর ফ্রেম করে ঝুলাই তখন মনে হয়, আরে ভালোই তো হয়েছে। বাসায় লোকজন এলে প্রথমে ছবিগুলো দেখে একটা ধাক্কা খায়। ওই ধাক্কাটা দেখতে ভালো লাগে।

নাসির : *অন্যের পেইটিংস দেখেন?*

হুমায়ূন : একসময় দেখতাম। এখন যেতে ইচ্ছে করে না। এখন গর্তজীবী হয়ে গেছি। গর্তে বাস করাটা এখন আনন্দময় মনে হয়। যা দরকার তা ঘরেই যেন থাকে—প্রচুর বই, প্রচুর সিডি, বড় টিভি, প্রচুর ভিডিও।

নাসির : *মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরও লিখবেন?*

হুমায়ূন : না। মনে হচ্ছে লেখক হিসেবে যে দায়িত্ব ছিল সেটা পালন করতে পারছি না। আগে যখন *১৯৭১*, *শ্যামল ছায়া* লিখেছি তখন অসম্পূর্ণ মনে হতো। এখন বইটা (*জোছনা ও জননীর গল্প*) লেখার পর কোনো আফসোস নাই। আমি আমার উপন্যাসটা লিখেছি। আমি এটুকু বলতে পারি, লেখালেখির মধ্যে আমি কখনো ভান করি না। ব্যক্তিজীবনেও ভানের অংশ কম। লেখালেখিটা আমার কাছে উপাসনার মতো মনে হয়।

নাসির : *বইটা নিয়ে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারছেন?*

হুমায়ূন : আমার মেয়ে শিলার কাছে জানতে চাইলাম। ও বলল, তোমাদের নিজেদের জীবনের হত্যাগুলো না লিখলে পারতে। বইটি সে কাঁদতে কাঁদতে পড়েছে এবং ছোট বোনকে বলেছে—বইটা এখন পোড়ো না, খুব মন খারাপ হয়ে যাবে। সামনে তোমার পরীক্ষা। আমার মনে হয় বইটা পছন্দ হয়েছে মেয়েটার। অন্যদের কথা জানি না।

নাসির : *সরাসরি পাঠকদের সঙ্গে আলাপ হয়নি?*

হুমায়ূন : আমি আসলে বেশির ভাগ সময় সমস্ত টেলিফোন অফ করে রাখি। মোবাইলও। বাসায় আসলে নিচে বলে পাঠাই, বাসায় নাই।

নাসির : *ইদানীং এমন করেন, না চার-পাঁচ বছর আগেও এমন ছিলেন?*

হুমায়ূন : আগে এত ছিল না।

নাসির : *কেন এমন করেন, ব্যস্ততা?*

হুমায়ূন : ব্যস্ততা ছাড়াও সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় সাদ্দাম হোসেনের মতো গর্তে বাস করতে পারলে ভালো হতো।

নাসির : *সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চান কেন?*

হুমায়ূন : জানি না।

নাসির : *কী বই পড়েন?*

হুমায়ূন : বেশির ভাগই পড়ি সায়েন্সের বই। পিওর সায়েন্স। গ্রহ, নক্ষত্র, ওয়ার্ল্ডের

AMARBOI.COM

ডাইমেনশন। গল্প, উপন্যাস একদম পড়া হচ্ছে না। ফিলসফি পড়তে চেষ্টা করেছি। ভালো লাগেনি। ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট মনে হইছে। বিজ্ঞান তো তা না, স্পষ্ট।

নাসির : *আপনার বেশির ভাগ লেখায় বিজ্ঞান অনুপস্থিত।*

হুমায়ূন : বিজ্ঞান তো নানানভাবে আসে। উপন্যাসে ফিজিক্সের সূত্র নিয়ে ডিল করতে পারি না। তবে যখন লিখি, তখন পড়লে বোঝা যায়, বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখকের ধারণা আছে। মিসির আলীর লেখাগুলোয় লজিক থাকে। হিমু অন্য রকম। সায়েন্স ফিকশন পড়লেও পাঠক বুঝবে, লোকটা বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে।

নাসির : *উপন্যাস-গল্প আর সায়েন্স ফিকশন আলাদা না?*

হুমায়ূন : সায়েন্স ফিকশন কিন্তু আসলে ফিকশন। এটা সাহিত্যের একটা অংশ। যদিও এটা স্বীকার করতে অনেক সময় লেগেছে। বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রও যে ১০০ ভাগ সত্যি, কোনো বিজ্ঞানীই বুকে হাত দিয়ে এখনো বলতে পারে না। আলোকে বলা হয় তরঙ্গ। এটা স্বীকৃত। তরঙ্গ প্রবাহিত হতে তো একটা মিডিয়াম লাগে। কিন্তু কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এর ব্যাখ্যা এখনো বিজ্ঞানীরা দিতে পারে নাই।

নাসির : *স্পেস... ।*

হুমায়ূন : আমার একটা খুবই দামি টেলিস্কোপ আছে। মনে করো, মঙ্গলের ওপর ধরলে। যখন পৃথিবীটা ঘুরবে, টেলিস্কোপের সেটিংয়ে ফোকাস থাকে না। আমারটা হলো পৃথিবী যে গতিতে ঘুরবে টেলিস্কোপও ওই গতিতে ঘুরবে। সারা দিন তাকিয়ে থাকতে পারবে। কম্পিউটারের সঙ্গে কানেকটেড। এখন করি না। কারণ ম্যানুয়াল হারিয়ে গেছে। আমার তিনটা টেলিস্কোপ আছে।

নাসির : *গ্রহ-নক্ষত্র দেখলে আপনার কী মনে হয়?*

হুমায়ূন : মনে হয়—মাই গড! আমরা এত ছোট! ক্ষুদ্র! তার পরও এত ক্ষমতা! হিউম্যান রেসের আমি একজন সদস্য, এটা ভাবতেও ভালো লাগে। গড এতই বিশাল ব্যাপার। গড কী, এটা আমাদের ব্রেইনে বোঝা সম্ভব না। এখানেই ব্রেইনটা মোটামুটি লিমিটেড। আমি তো চার-পাঁচ ডাইমেনশনের বেশি চিন্তা করতে পারছি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবীটা ১০ ডাইমেনশনের। এখানে কিন্তু আবার ক্ষুদ্রতাটা ধরা পড়ছে। আবার যখন ম্যাথমেটিক্সে যাই তখন ব্রেইনের ক্ষমতা ধরা পড়ে।

নাসির : *মানুষ চাঁদে গেছে, মঙ্গলে যাওয়ার চিন্তা করতেছে, কিন্তু মানুষের বিপর্যয় বিজ্ঞান কমাইতে পারে নাই। মৃত্যুহার কমে নাই।*

হুমায়ূন : এটা ঠিক না। একটা সময় ছিল আমাদের দেশে গ্রামের পর গ্রাম কলেরায় খালি হয়ে গেছে। কলেরা এখন দূর করেছি। টিবি, ম্যালেরিয়া,

AMARBOI.COM

পোলিও জয় করেছি। আমি সিওর, একদিন ক্যানসারমুক্ত পৃথিবী হবে। পৃথিবী ডিজিসমুক্ত হবে।

নাসির : *একটা বড় সমস্যা ক্ষুধা।*

হুমায়ুন : শায়েস্তা খাঁর আমলে যখন জিনিসপত্র খুবই সস্তা ছিল তখন কত লোক মারা গেছে না খেয়ে। এখন লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুড প্রডাকশনও কিন্তু বাড়ছে। তখন লঙ্গরখানা তৈরির প্রয়োজন কিন্তু এখন নাই। সাহায্যটা করছে কারা? বিজ্ঞান। কাজেই তুমি যদি বলো বহু লোক ক্ষুধায়, দারিদ্র্যে মারা যাচ্ছে, তা কিন্তু না। গায়ে কাপড় আছে। একটা সময় তাও ছিল না। সবই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞান আমাদের ক্ষুধা ও ডিজিস থেকে মুক্তি দেবে, দিতেই হবে। যদি বলো অ্যাটম বোমা পেয়েছি। এটাও তো একটা পার্ট। খারাপও তো হয়।

নাসির : *বিজ্ঞান তো ব্যবহার করে পুঁজিবাদী বিশ্ব। গবেষণাকেও ওরা নিজের মতো করে...*

হুমায়ুন : খুব কম। যখন বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল না, তখন ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধেও অনেক লোক মারা গেছে। পুঁজিবাদীরা ফলাফলটা বেশি নিচ্ছে। কারণ তাদের অর্থনৈতিক জোরটা আছে। আমাদের সেটা নাই। ওরাও বুঝতে পারবে, ওদের টিকতে হলে আমাদের দরকার।

নাসির : *স্টিফেন হকিং বলতেছে ডিম আগে না মুরগি আগে, উনিও কনফিউশড? কোনটা প্রথম সৃষ্টি?*

হুমায়ুন : প্রথম সৃষ্টি তো বলছে ওরা বিগ ব্যাং। তার আগে কী তা তো সায়েন্স বলতে পারছে না।

নাসির : *মহাকাশে যেতে ইচ্ছা হয়, যখন গ্রহ-নক্ষত্র দেখেন?*

হুমায়ুন : খুবই। কিন্তু আমি না পারলেও আমার পরবর্তী জেনারেশন চাঁদে-মঙ্গলে যেতে পারবে। আমি তাদের খুবই ঈর্ষা করছি।

নাসির : *তারা তো পৃথিবীর বাইরে গ্রহ-নক্ষত্রে ছড়ায়া পড়বে।*

হুমায়ুন : অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে।

নাসির : *আপনার কি মনে হয় আবহাওয়াজনিত কারণে আগামী শ-দুই শ বছরে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে?*

হুমায়ুন : না, অযোগ্য হবে না। ওজোন লেয়ার যদি ছিদ্র হয়ে থাকে প্রকৃতি সিস্টেম করে এটাকে বন্ধ করবে, যাতে মানুষ বাঁচে। নয়তো উল্কাপাত যে ভয়াবহ জিনিস, সেটা পৃথিবীতে হয় না কেন? বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ বল এতই প্রবল যে, যখন পৃথিবীতে কোনো কিছু আসতে চায় তাকে সে টেনে নিজের গায়ের ওপর নিয়ে নেয়। আমি যদি বলি, ক্রিয়েটর পৃথিবীকে রক্ষার জন্যই বৃহস্পতি তৈরি করে

AMARBOI.COM

রেখেছে! হঠাৎ ধ্বংসে আমি বিশ্বাস করি না। গড অলমাইটি অথবা প্রকৃতি আমাদের প্রটেকশন দিয়ে রেখেছে।

নাসির : *আপনার কাছে আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা কী কী?*

হুমায়ূন : প্রধান সমস্যা অসহিষ্ণুতা।

নাসির : *কাদের মধ্যে আছে?*

হুমায়ূন : আমাদের মধ্যেও আছে। বাসে ওঠার একটা লাইন করতে পারি না। তাড়াহুড়া। কোরআনে একটা লাইন আছে, 'হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।' আমার সব সময় মনে হয়, আমাদের দেশের মানুষদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ ওই কথা বলেছেন।

নাসির : *আর কী?*

হুমায়ূন : শিক্ষার অভাব।

নাসির : *ক্ষুধা-দারিদ্র্যকে একজন লেখক হিসেবে কীভাবে দেখেন? এদের নিয়ে ভাবেন?*

হুমায়ূন : ব্রেইন মানুষের সিঁড়ি তৈরি করে দেয়। কোনো কিছু দেখতে খারাপ লাগলে ব্রেইন অটোমেটিক্যালি একটা পর্দা তৈরি করে দেয়, যেন সে ওইটা না দেখে। এখন সবার মধ্যে ওই রকম পর্দা পড়ে গেছে। ফকির দেখলে ওদের দুঃখটা ব্রেইন নিতে দিচ্ছে না। তা না হলে কোনো মানুষ কিন্তু বাসায় বসে পাঁচটা-সাতটা তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারত না।

আমি যখন আমার বাচ্চাগুলো নিয়ে আমেরিকা থেকে এলাম, তখন বড় মেয়ে নোভার বয়স পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ। '৮৪-তে। ও তো জন্মের পর থেকে ফকির দেখে নাই। যখন দেখছে লোকজন এসে ফুড চাচ্ছে, খুবই অবাক হয়ে বলল, হাউ কাম? তাদের কি ফুড নাই? এটা তাকে খুবই আহত করল; তার মধ্যে একধরনের সমস্যা তৈরি হলো। যে-ই দেখত ফকির আসছে, সে ফ্রিজ খুলত, যা আছে দিত। বাবা হিসেবে বলতে পারছি না, মা এটা কোরো না। তখন টাকাপয়সা কম ছিল। অল্প ফল কিনেছি হয়তো। ও নিয়ে দিয়ে দিল। আটকাতে পারছি না। আবার ভালোও লাগছে—ওর মধ্যে আবেগটা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই মেয়ে যখন বড় হলো, সে অভ্যস্ত হয়ে গেল। কারণ পর্দাটি তৈরি হয়েছে। আমরা কনভিশনড হয়ে যাই।

নাসির : *আগামী ১৩ নভেম্বর তো আপনার জন্মদিন। এবারের জন্মদিনটা কীভাবে পালন করবেন?*

হুমায়ূন : আমি 'দখিন হাওয়া'তেই থাকব। বন্ধুরা আসবে। জম্পেশ আড্ডা দিব। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করব আরকি।

AMARBOI.COM

নাসির : *অপরিচিত বা সাধারণ কেউ আসলে ঘরে ঢুকতে দিবেন?*
হুমায়ূন : আমার দরজা খোলা থাকবে। তবে কেউ মালা-টালা নিয়া ব্যারাছাড়া করলে আমার ভালো লাগবে না। ঘটা করে আমি জন্মদিন পালন করতে চাই না। কিন্তু কেউ যদি তাদের মতো করে আমার জন্মদিন করতে চায়, আমি আপত্তি করব কেন?

১১ নভেম্বর ২০০৫

৪

'অর্ধেক হিমু, অর্ধেক মিসির আলী'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ইকবাল হোসাইন চৌধুরী**

AMARBOI.COM

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী : *হিমুর শুরুটা কীভাবে?*
হুমায়ূন আহমেদ : ময়ূরাক্ষী নামে আমি একটি উপন্যাস লিখেছিলাম। সেখানে হিমু নামের একটি চরিত্র ছিল। লেখার পর দেখলাম এই হিমু চরিত্রটিকে আমার নিজের ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। এই ভালো লাগা থেকেই হিমুর দ্বিতীয় বইটি লিখে ফেললাম। ব্যস, এভাবেই শুরু।
ইকবাল : *আপনি বলেছেন হিমু কাজ করে অ্যান্টি-লজিক নিয়ে। আর মিসির আলী কাজ করেন লজিক নিয়ে। জরিপে হিমু প্রথম। মিসির আলীর অবস্থান দশে। এটা কি লজিকের ওপর অ্যান্টি-লজিকের বিজয় নয়?*
হুমায়ূন : না, আসলে ঠিক সেটা নয়। হিমু অনেকটা ইচ্ছাপূরণ-টাইপ একটি চরিত্র। আমাদের অনেক ইচ্ছাই পূরণ হয় না। সব মানুষের একটি গোপন বাসনা থাকে। সেটা হলো ইশ্, আমার যদি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকত। যদি আমি যা বলি তা-ই হতো। হিমুর মধ্যে মানুষের এই অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করার ব্যাপারটি আছে। সেটি হঠাৎ যে-কাউকে বাসি পোলাও খাওয়ানোর মতো ছোটখাটো ইচ্ছা পূরণও হতে পারে। অন্যদিকে মিসির আলীর কাজ যুক্তি বা লজিকভিত্তিক। লজিক মানেই অঙ্ক। অঙ্ক খুব জনপ্রিয় হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। আবার লজিকই তো দুনিয়ার সবকিছু নয়।

ইকবাল : *হিমু এবং মিসির আলী দুজনের কোনজন আপনার প্রিয়?*

হুমায়ূন : মিসির আলী। আমার আশপাশে মিসির আলীর মতো মানুষ খুব বেশি দেখি না। মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার নিজেকেই মিসির আলী মনে হয়। আবার হিমুর সঙ্গেও মিল আছে। হিমু যা ইচ্ছা তা-ই করে। আমিও যা ইচ্ছা তা-ই করি। কে কী বলল বা ভাবল সেটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাই না। একবার সেন্ট মার্টিনে বাড়ি বানানোর শখ হলো। বানিয়ে ফেললাম। অথচ আমি জানি, সেই বাড়িতে দু-তিন বছরেও আমার একবার থাকা হবে না। আমি আসলে অর্ধেক হিমু। অর্ধেক মিসির আলী। হা হা।

ইকবাল : *হিমুকে নিয়ে আপনার স্মরণীয় কোনো অভিজ্ঞতা?*

হুমায়ূন : অনেক ঘটনা আছে। জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট বই মেলায় গেছি। হলুদ পাঞ্জাবি পরা এক তরুণ আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে বসল। বলল, স্যার আমি জার্মান হিমু। অবশ্য এমনও হতে পারে সে আমাকে দেখেই হিমু সেজেছিল। গুলশানে একটি ক্লিনিক আছে মুক্তি ক্লিনিক। সেখানে একটি ওয়ার্ডের নাম রাখা হয়েছে হিমু। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণেই আমি একবার সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে অনেক পুরুষ হিমুর সঙ্গে একজন মহিলা হিমুর দেখাও আমি পেয়েছি। মেয়েটিকে পুলিশ আটক করেছিল বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে। রাতের বেলা। কলেজপড়ুয়া সে মেয়েটি হিমুর বইয়ে পড়েছে, রাতের বেলা খুব জ্যোৎস্না হলে পথঘাট সব নদী হয়ে যায়। সেই নদী দেখতেই সে শূন্য রাস্তাঘাট খুঁজে না পেয়ে রানওয়েতে বসেছিল। সে মহিলা হিমুকে আমি জিজ্ঞেস করেছি সে সত্যি সত্যিই নদী দেখেছে কি না। তার উত্তর ছিল হ্যাঁ। আসলে পুরোটাই তার কল্পনা। আরেকটা কথা, হিমু ওয়ার্ডের হিমুরা আমাকে সামনা-সামনি দেখে খুব পাত্তাটাত্তা দেয়নি। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ইকবাল : *আজ থেকে ১০০ বছর পর হিমু-মিসির আলী সাহিত্যজগতে টিকে থাকবে?*

হুমায়ূন : রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে। একটি মানবশিশু জন্মের পর অবাক বিস্ময়ে চারপাশের জগৎকে দেখছে। আর বলছে—

ইকবাল : *হে প্রিয় আমি যতদিন আছি/ তুমিও থাকিও।*

হুমায়ূন : আমার মৃত্যুর পর হিমু-মিসির আলীর কী হলো সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমার চিন্তা আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত হিমু-মিসির আলীর কী হলো সেটা নিয়ে।

২১ জানুয়ারি ২০০৬

AMARBOI.COM

৫

'লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরি'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ইকবাল হোসাইন চৌধুরী**

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী : কাঠপেন্সিল *বইয়ের ভূমিকায় আপনি লিখেছেন, 'বলপয়েন্ট', 'কাঠপেন্সিল' সহজিয়া ধারার লেখা। শেষ পর্ব 'ফাউনটেনপেন' হবে কঠিনিয়া। কঠিনিয়া ব্যাপারটা আসলে কী?*

হুমায়ূন আহমেদ : কাঠপেনসিলের লেখা রাবার দিয়ে মুছে ফেলা যায়। ফাউন্টেনপেনের লেখা মুছে ফেলা কঠিন। বোধ হয় সে অর্থে বলা। *ফাউন্টেনপেন* ধরনের লেখা লেখার জন্য বয়সটা মনে হয় আরেকটু বেশি হওয়া দরকার। দেখি কত দিন টিকে থাকা যায়।

ইকবাল : *বৃদ্ধ বোকা সংঘের প্রসঙ্গ অনেকবার এসেছে কাঠপেন্সিল-এ। এই সংঘের শুরুটা কীভাবে?*

হুমায়ূন : ধানমন্ডির দখিন হাওয়ায় তখন আমি একা থাকি। আগের গিন্নির সঙ্গে একটা সমস্যার কারণে আমি ছিলাম একরকম পরিবার থেকে বিতাড়িত। সেই সময়ে একাকিত্ব কাটানোর জন্য আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছাকাছি নিয়ে আসার একটা চেষ্টা করলাম। আলমগীর রহমান, মাজহার, করিম—ওরা সবাই আমার কাছাকাছি বাসায় থাকতে শুরু করল। সন্ধ্যা হলেই ওরা সবাই আমার এখানে এসে বসত। বাড়িতে গৃহিণীরা থাকলে তারা তো আড্ডা দিতে দেয় না। আমার এখানে সে অসুবিধে নেই। আড্ডায় প্রায় সবাই মোটামুটি বৃদ্ধ। তাই নাম দিলাম বৃদ্ধ বোকা সংঘ বা ওল্ড ফুলস ক্লাব। বৃদ্ধ বোকা সংঘের সদস্য হওয়ার বিশেষ কোনো শর্ত নেই। শুধু বৃদ্ধ আর বোকা হওয়াটা জরুরি।

ইকবাল : *বলপয়েন্ট* এবং *কাঠপেন্সিল* দুটো বইই সুখপাঠ্য। আত্মস্মৃতি উপভোগ্য করে লেখার কৌশলটা কী?

হুমায়ূন : কোনো সূত্র তো বলতে পারি না। লেখালেখির কৌশল জেনে যদি বড় লেখক হওয়া যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে বড় লেখক হতেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছেলে। সেটা হয়নি। সহজ এবং আন্তরিকভাবে যদি লেখা যায় সে লেখা অবশ্যই ভালো হবে। যেটা লিখছি, সেটা বিশ্বাস করে লিখতে হবে। লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরি। এটা আমার ব্যক্তিগত

AMARBOI.COM

ধারণা। *আমার ছেলেবেলা* এবং *কিছু শৈশব*—এ দুটো স্মৃতিকথা লিখে আমি নিজে খুব আনন্দ পেয়েছি।

ইকবাল : কাঠপেন্সিল-*এ রাইটার্স ব্লক নিয়ে একটা অধ্যায় আছে। আপনার কখনো 'ব্লক' হয়নি ভেবে আপনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।*

হুমায়ূন : এখনো আমি ব্লকের মধ্যে আছি। আমি চাই যে প্রতি মেলায় হিমুর একটা বই থাকুক। পয়লা ফাল্গুন হিমুর একটা বই প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল। এবার এত চেষ্টা করলাম, হলো না। বারবার কাহিনি পাল্টাচ্ছি, কিন্তু হচ্ছে না। এবার নুহাশ পল্লীতে আসার প্রধান কারণ হিমুর উপন্যাসটা শেষ করা। দেখি পরিবেশ-টরিবেশ বদলে যদি কিছু লাভ হয়।

ইকবাল : *বইমেলায় আপনি খুব কম যান। কোনোদিন আপনি গেলেই মহা হুলস্থুল পড়ে যায়।*

হুমায়ূন : ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের নাম লেখার মতো ক্লান্তিকর কাজ আর আছে কি না আমি জানি না। আবার মেলায় অন্য রকম বিড়ম্বনা তো আছেই। ধরো, এক অটোগ্রাফ-শিকারি বালককে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নামের বানান কী? সে নিজেই সবকিছু গুলিয়ে ফেলল। হতবিহ্বল হয়ে তার মাকেই জিজ্ঞেস করল—মা আমার নামের বানান কী? যা-ই হোক, নাম লিখে দিলাম। তারপর বলল, স্যার, আপনার হাতটা একটু ধরি। বললাম, ধরো। এদিকে পেছন থেকে অন্য লোকজন সমানে ধাক্কাচ্ছে। আমার ওপরেই টেবিল ভেঙে পড়ার জোগাড়। একটা বয়সে এসব ভালো লাগত।

ইকবাল : কাঠপেন্সিল *বা বলপয়েন্ট-এ অনেক ঘটনা আপনি লিখেছেন। এর বাইরে বলার মতো কোনো ঘটনা কি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, যেটা লেখা হয়নি?*

হুমায়ূন : সেবার চট্টগ্রামে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আমাকে খুব আদরযত্ন করে নিয়ে যাওয়া হলো। গিয়ে বুঝলাম, জীবনে যত বোকামি করেছি, তার মধ্যে এটা অন্যতম। একজন বক্তা মঞ্চে গেলেন আমার সম্পর্কে বলতে। ভদ্রলোক যা বললেন তার সারবস্তু হচ্ছে, হুমায়ূন আহমেদের পাঠকদের সবাই 'পোলাপান' এবং এই লেখক শুধু মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখেন। উনি মাঝিদের নিয়ে কিছু লেখেননি। খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে কিছু লেখেননি। যিনি বলছেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। একসময় আমার বন্ধুমানুষ ছিলেন। অকস্মাৎ এই কঠিন আক্রমণে আমি যাকে বলে হতবাক। তার চেয়ে বেশি অবাক হলো অনুষ্ঠানে আগত দর্শকেরা। দেখলাম, তারা এই মন্তব্য নিতে পারছে না। আমি বক্তৃতা দিতে

AMARBOI.COM

উঠে অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালাম—এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক যাকে বলা হয় তিনি সারা জীবন রাজা-বাদশা-রাজকন্যা ছাড়া অন্যদের নিয়ে কিছুই লেখেননি। আমি তো তাও মধ্যবিত্ত নিয়ে লিখি। উনি তো রাজা-বাদশার নিচেই নামেননি। তাঁর নাম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। লেখকের যদি ক্ষমতা থাকে তিনি যেকোনো বিষয় নিয়ে ভালো লিখতে পারেন। কোন বিষয় নিয়ে লিখছেন সেটা নয়। লেখকের ক্ষমতা কতটুকু সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। লেখক হতে হলেই শুধু মাঝিদের নিয়ে লিখতে হবে, এই যুক্তি ভুল যুক্তি। মানুষের সম্পর্কটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্ক রাজা-রানির বেলায় যা, মধ্যবিত্তদের বেলায়ও তা।

ইকবাল : *কাছের-দূরের, খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষজনের কথা আপনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন। এই লেখালেখির কারণে কোনো বিড়ম্বনায় কি পড়তে হয়েছে?*

হুমায়ূন : আমার প্রথম ছবি *আগুনের পরশমণি* তৈরির সময়কার কথা। সংগীত পরিচালক সত্য সাহা একদিন আমার কাছে এলেন। বললেন, আমি এত দিন কাজ করছি কিন্তু একটা জাতীয় পুরস্কার পেলাম না। এবার ভালো একটা কাজ করতে চাই। তাঁর কথা শুনে আমার খারাপ লাগল খুব। তাঁর ছাত্ররা সবাই জাতীয় পুরস্কার পেয়ে গেছে। তিনি এত গুণী একজন শিল্পী, জাতীয় পুরস্কার পেলেন না! কিন্তু এর মধ্যে আমি মিন্টুকে কথা দিয়ে ফেলেছি। একরকম নিয়ম ভঙ্গ করে মিন্টুকে বাদ দিয়ে সত্য সাহাকে নিলাম। সে বছরের জাতীয় পুরস্কারটা তিনিই পেয়েছিলেন। সত্য সাহাই খবরটা আগে ফোনে আমাকে জানিয়েছিলেন। পরদিন একদম ভোরবেলায় মিষ্টি নিয়ে তিনি চলে এলেন আমার বাসায়। এত আনন্দিত মনে হচ্ছিল তাঁকে। আমি সেই ঘটনা আমার বইয়ে লিখলাম। লেখাটা তিনি নিতে পারলেন না। বললেন—তিনি তো পুরস্কারের জন্য কাজ করেননি। এটা একটা কষ্টের ঘটনা। কে ইচ্ছে করে অন্যকে আঘাত করতে চায়, বলো?

ইকবাল : *মানুষের স্বল্প আয়ু নিয়ে আপনার দুঃখবোধ আছে।*

হুমায়ূন : অবশ্যই। আমি অন্তত ১০০০ বছর বেঁচে থাকতে চাই। বাঁচতে চাই মানুষের বিজয় দেখার জন্য। একটা সাধারণ কচ্ছপ ৩০০-৪০০ বছর বাঁচে। অথচ মানুষের মতো বুদ্ধিমান একটা প্রাণী বাঁচে বড়জোর শ খানেক বছর। বিশাল দুঃখের ব্যাপার।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০

AMARBOI.COM

৬

বাদশাহ নামদার হুমায়ূন

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আলীম আজিজ** ও **তৈমুর রেজা**

প্রশ্ন : *সরাসরি বইয়ের প্রসঙ্গে চলে আসি।* বাদশাহ নামদার *উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে অনেক বেশি মিল আছে গুলবদন বেগম প্রণীত* হুমায়ুন-নামা *গ্রন্থের।*

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, সেই বইটা আমার কাজে এসেছে। তবে আমি অনেক কিছু নিয়েছি জওহর আফতাবচির কাছ থেকে, বাদশাহ হুমায়ুনকে যিনি পানি পান করাতেন।

এই লোকটি সব সময় বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখনো তিনি তাঁকে ছেড়ে যাননি। এমনকি আকবরের যখন জন্ম হয়েছে তখনো জওহর আফতাবচি সঙ্গে ছিলেন।

প্রশ্ন : *আপনি সাধারণত সমকাল নিয়েই লেখালেখি করেন। হঠাৎ বাদশাহ হুমায়ুনকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলেন কেন?*

হুমায়ূন : *বাদশাহ নামদার* বইটি লেখার কারণ আমি বইয়ের ভূমিকাতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। ছোটবেলায় আমি যখন ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ি, তখন আমাকে বেশ ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ছাত্ররা আমাকে ডাকত 'হারু হুমায়ূন'। কারণ শের শাহর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে আমি হেরেছি। পালিয়ে বেড়িয়েছি। আমি বলতাম, আমি হারছি নাকি? সবাই বলত, 'হারু হুমায়ূন, হারু হুমায়ূন'। এটা একটা কারণ। আরেকটা হতে পারে, চিতোরের রানি যখন সাহায্য চেয়ে তাঁর কাছে রাখিবন্ধন পাঠালেন, তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে সব ফেলে রেখে ছুটলেন—এই পাগলামিগুলো আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

প্রশ্ন : *হারু হুমায়ূন আপনার লেখায় আগে বোধ হয় কখনো আসেনি। হঠাৎ করে আপনার সঙ্গে এর যোগসূত্র হলো কীভাবে? হঠাৎ করে কেন মনে এল হুমায়ূনকে নিয়ে লিখতে হবে?*

হুমায়ূন : আসলে আমার আকর্ষণ তাঁর খ্যাপা ধরনের জন্য। এই রকম একটা পাগল লোক। ভিস্তিওয়ালা তাঁর জীবন রক্ষা করেছে বলে আধাবেলার জন্য তাঁকে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। এটা পাগলামি ছাড়া আর কী! তুমি তাকে টাকাপয়সা দাও। একেবারে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া—এটা কোনো কাজ হলো? তার মানে, তুমি এত হেলাফেলা করে ভাবো? এইটা আমাকে খুবই

AMARBOI.COM

সারপ্রাইজ করল। চিতোরের রানিকে সাহায্য করতে তিনি সব ফেলেফুলে ছুটলেন। এটাও সারপ্রাইজিং। তারপরে রক্তবর্ণ কাপড় পরে তিনি যে মানুষ হত্যা শুরু করলেন—এটা কিন্তু ইতিহাস থেকে নেওয়া। সেখানে একটা ছেলে এসে গান গাইল। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। মোগল চিত্রকলার শুরুটা কিন্তু হুমায়ুনের হাতে। তাঁর আগে মোগল চিত্রকলা ছিল না। তিনি পারস্য থেকে চিত্রকর নিয়ে এলেন। ভারতে তিনিই প্রথম মানমন্দির তৈরি করেছেন। কেন? কারণ তিনি পারস্যে মানমন্দির দেখে আসছেন। তাঁর মৃত্যুও হয়েছে কিন্তু ওই মানমন্দিরের কারণে। সকালে ফজরের আজান হয়েছে। তিনি জানেন সকালে ফজরের আজানের সময় শুক্র গ্রহ, মানে—সন্ধ্যাতারাটা ওঠে। ওটা দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পরনের কাপড়ে আটকে তিনি পড়ে যান। এসব ঘটনা, একটা ক্যারেক্টার এত বিচিত্র হতে পারে? এত খেয়ালি হতে পারে। বৈরাম খাঁর কথা পড়েছ না?

প্রশ্ন : *অনেকে মনে করেন, দুই ধরনের সাহিত্যিক থাকে। পপুলার লেখক আর সিরিয়াস লেখক। সিরিয়াস সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায়, তাঁরা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন। এই বই দিয়ে আপনি ইতিহাসের দিকে ঝুঁকছেন। জনপ্রিয় সাহিত্যিকের খাতা থেকে নিজের নাম কি কাটাতে চাচ্ছেন?*

হুমায়ুন : না, না। আমি আমার আগের যে খাতা, সেটাতেই বহাল আছি। আমার খাতা একটাই। আমি এমনিতে ইতিহাসের খুব মনোযোগী পাঠক। ইতিহাসে আমার আগ্রহ আছে। এখানে বাসায় যে বইগুলো দেখছেন, সেটা কিন্তু আমার মূল লাইব্রেরি না। আমার অনেক বই স্কুলে আছে। তারপর নুহাশ পল্লীতে আছে। লেখার থেকে আমি পড়ার পেছনে বেশি সময় দিই। এত জানার জিনিস আছে পৃথিবীতে। কিন্তু বাংলা বইয়ে ইতিহাস খুবই কাঠখোট্টাভাবে লেখা। এই লেখাগুলো তো কেউ পড়ে না। আমার ইচ্ছে করে এসব গল্প পাঠকের সঙ্গে শেয়ার করতে। গল্পগুলোই আসলে আমাকে ইনস্পায়ার করে। আমার বাসায় গুলবদনের বই সাত বছর ধরে আছে। শাওন কখনো পড়ার আগ্রহ পায়নি। কিন্তু *বাদশাহ নামদার* যখন ও পড়ে শেষ করল, তখন গুলবদনের বই তাকে টানতে শুরু করল। এখন সে গুলবদন পড়ছে, *বাবরনামা* পড়ছে।

প্রশ্ন : বাদশাহ নামদার *লিখতে গিয়ে আপনি নিজেই হুমায়ুন চরিত্রটির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, এমন কি কখনো মনে হয়েছে?*

হুমায়ুন : না, আমি নিজেকে কখনো তাঁর জায়গায় কল্পনা করিনি। কারণ যে নির্দয়তা তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলো ভয়াবহ। আমি কখনো এসব ভাবতে পারি না। একটা মানুষের মধ্যে তো ভালো-মন্দ দুইটাই থাকবে, ওনার মধ্যেও পুরোপুরি ছিল।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : *আপনার টিপিক্যাল চরিত্রগুলো এই বইয়ে প্রায় অনুপস্থিত। দুজন মাত্র চরিত্রকে আপনার চেনা ধরনের সঙ্গে মেলানো যায়। হরিশঙ্কর আচার্য আর হামিদা বানু। যেমন হামিদা বানু জ্যোৎস্না দেখতে ভালোবাসে।*

হুমায়ূন : হামিদা বানু চরিত্রটা ঐতিহাসিকভাবেই এমন। জ্যোৎস্না দেখতে ভালোবাসে। একটু চঞ্চল, একটু ছটফটে। হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর যখন বিয়ে হবে তখন হামিদা বানুর বয়স মাত্র পনেরো। হুমায়ুনের চারটা বউ আছে। হুমায়ুন মায়ের সঙ্গে রদখা করতে গিয়ে দেখলেন পনেরো বছরের একটি মেয়ে তাঁকে কুর্নিশ করছে। তিনি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, মেয়েটা কে? জানা গেল, একজন শিক্ষকের মেয়ে। হুমায়ুন বললেন, আমি একে বিবাহ করতে চাই। হামিদা বানু বিয়ের কথা শুনে বললেন, এটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি এমন কাউকে বিয়ে করব, যাঁর হাত আমি যখন ইচ্ছে ধরতে পারি, যাঁকে দেখলে আমার কুর্নিশ করতে হবে না। আর ইনি তো রাজ্যহারা লোক। একে আমি বিয়ে করতে যাব কেন? এসব আমার বইয়ের মধ্যে আছে।

প্রশ্ন : *তো স্যার, এই বইয়ের মধ্যে আপনি যেমন আলাদা হয়ে উঠেছেন, এটা কি আপনি সচেতনভাবেই চেষ্টা করেছিলেন?*

হুমায়ূন : না, না। দেখো, পৃথিবীতে দুই ধরনের লেখক আছে। একটা হলো স্পনটিনিয়াস রাইটার। আরেকটা ধরন হলো, চিন্তাভাবনা করে বইপত্র পড়ে ধীরেসুস্থে লিখবে। *অল থ্রু মাই লাইফ আই ওয়াজ এ স্পনটিনিয়াস রাইটার*। এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। তবে এই স্পনটিনিয়াস রাইটিংয়ের জন্য আমাকে ইতিহাস পড়তে হয়েছে। তথ্যগুলো ব্রেইনের একটা অংশে ছিল। কিন্তু আমি লিখেছি স্পনটিনিয়াসলি। চিন্তাভাবনা করে, এটা করব ওটা করব—এসবের মধ্যেই আমি নেই।

প্রশ্ন : *এই বইয়ে আপনার লেখার স্টাইলে পরিবর্তন স্পষ্ট, যেমন আপনার লেখায় হিউমার খুব পরিচিত ব্যাপার, কিন্তু এই বইতে কোথাও কোথাও ঝিলিক থাকলেও হিউমার প্রায় নেই।*

হুমায়ূন : হ্যাঁ। এই বইয়ে আমার স্টাইলগত পরিবর্তন অবশ্যই আমার ইচ্ছাকৃত। এখানে আমি প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছি। পুরোনো বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেছি। পুরোনো আবহটা আনার জন্য। যেসব দীর্ঘ-ঈ কার আজকাল হ্রস্ব-ইতে লেখা হচ্ছে সেগুলোতে আমি দীর্ঘ-ঈকার ব্যবহার করেছি। পাণ্ডুলিপি হায়াৎ মামুদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে আমি বলেছি, আমি দীর্ঘ-ঈকারগুলো রাখছি, যাতে ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাটার্নে একটা পুরোনো দিনের ফ্লেভার তৈরি হয়। এটা সচেতনভাবে করা।

AMARBOI.COM

একটা ঘটনা বলি। *বিচিত্রার* শাহাদাত চৌধুরী আমাকে বললেন, আপনি তো লেখালেখি করছেন, এক কাজ করি। আপনাকে ট্যাগ করে দিই সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে। দুজনের মুখোমুখি একটা আলোচনা আমরা ছাপব। আমি রাজি হয়ে গেলাম। সৈয়দ হকের সঙ্গে বসলাম মুখোমুখি। তিনি প্রশ্ন শুরু করলেন এইভাবে, হুমায়ূন আহমেদ সাহেব। আপনার সব উপন্যাসই দেখি, হয় চার ফর্মায় শেষ হয়, নয় পাঁচ ফর্মায় কিংবা ছয় ফর্মায়। এভাবে ফর্মা হিসেবে কি উপন্যাস আসে আপনার মাথায়? আমি সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম, তাঁর ইনটেনশন খুব খারাপ। আমি তো পুরোপুরি ধরা খেয়ে গেছি। তখন বললাম, 'হক ভাই, আপনি যে সনেটগুলো লেখেন, এগুলো তো ১৪ লাইনে লেখেন। আপনার ভাব যদি ১৪ লাইন মেনে আসতে পারে, আমার উপন্যাস ফর্মা হিসেবে এলে অসুবিধা কী?'

প্রশ্ন : *আপনি এর আগে ঐতিহাসিক যেসব উপন্যাস লিখেছেন, সেখানে ন্যারেটর হিসেবে আপনার সাধারণ মানুষকে পাই। এখনকার সাব-অল্টার্ন স্টাডিস বা তলা থেকে দেখা ইতিহাসের সঙ্গে এই ব্যাপারটা খুব খাপ খায়। কিন্তু* বাদশাহ নামদার *উপন্যাসের প্রায় পুরো গল্পটাই অভিজাতদের প্যাঁতান থেকে বলা। ন্যারেটর হিসেবে নিম্নবর্গ বা তলার মানুষ নেই। এটা কেন হলো? আপনার কি কোনো লিমিটেশন ছিল?*

হুমায়ূন : লিমিটেশন তো ছিলই। আমি যাঁদের কাছ থেকে তথ্য নিচ্ছি, এঁদের একজন হচ্ছেন আবুল ফজল। একজন হচ্ছেন হুমায়ুনের বোন। একজন তাঁর পানি সরবরাহকারী আফতাবচি। আমাকে তো এঁদের কাছ থেকে তথ্যগুলো নিতে হয়েছে। আর সেই সময় হুমায়ুনের রাজসভায় যাঁরা গেছেন, তাঁদের কারও কারও ভাষ্যের সাহায্য আমি নিয়েছি। কাজেই নিচুতলার কারও ভাষ্য পাওয়ার সুযোগ ছিল না। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার কেউ নেই। এটা করতে গেলে আমাকে করতে হতো পুরোপুরি কল্পনার সাহায্য নিয়ে। সে ক্ষেত্রে আমি ইতিহাস থেকে আরও দূরে সরে যেতে পারতাম। এই উপন্যাসের একটা চরিত্র হচ্ছে ভিস্তিওয়ালা। সে যদি একটা বই বা উপন্যাস লিখে যেতে পারত, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা জানতে পারতাম।

প্রশ্ন : *এই উপন্যাসে আমরা দেখি, হুমায়ুন যখনই যুদ্ধ জয় করতেন, তখনই তিনি বিরাট উৎসবে মেতে উঠতেন। হেরেমের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি আফিম খেতেন, এটা আপনার উপন্যাসেই আছে। কিন্তু* বাদশাহ নামদার*-এ হেরেমটাকে আপনি কিছুটা এড়িয়ে গেছেন।*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, এটা আমি কিছুটা বাদ দিয়েছি। এই জিনিসটাকে আমার কাছে একটু অরুচিকর মনে হয়। পতিতালয় থাকবে একজন সম্রাটের, এটা কেমন কথা।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : *সেক্স বা সেক্সুয়ালিটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী—সাহিত্য বা ফিকশনের ক্ষেত্রে?*

হুমায়ূন : এটা নিয়ে আসাটাকে খুব মডার্নিস্ট মনে করা হয়। যিনি যত ভালোভাবে নিয়ে আসতে পারেন, তিনি তত মডার্ন লেখক, এটা ভাবা হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় লেখক যিনি, তাঁর নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনার গল্প-উপন্যাসে কোথাও সেক্সুয়ালিটি পেয়েছ? এক জায়গায় শুধু আছে, 'তখন তাহার শরীর জাগিয়া উঠিল।' এর বেশি তিনি আর আনেননি। শুধু 'জাগিয়া ওঠা' পর্যন্ত। পাঠকের কল্পনার ওপর তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : বাদশাহ নামদার-*এ ওই সময়ের জিওগ্রাফি, এনভায়রনমেন্ট, ওই সময়ের সোসাইটি, সাধারণ মানুষ—এর প্রায় কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এটা আপনার উপন্যাসে একটা ব্যত্যয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটা একটা খামতিও। এ ব্যাপারে আপনার নিজের কী মনে হয়?*

হুমায়ূন : তোমরা তো আমাকে কনফিউজ করে দিলে। ওই যে কালটা ধরা যাচ্ছে না বলছ, সেটা আমার মনে হয় না। আমাদের সেলিনা হোসেন গালিবকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছেন। সেই উপন্যাসে গালিব বলছেন, একজন স্ত্রী ভাত রাঁধতে পারলেই হলো। গালিবের স্ত্রী তো ভাত রাঁধতে পারেন না। বড়জোর রুটি বানাতে পারেন। এই ত্রুটিগুলো কিন্তু আমি করিনি। আর সাহিত্যিক তো ঐতিহাসিক না। ভারবাটিম তার সবকিছু ধরার দরকার নেই। তোমাদের কল্পনার জন্য জায়গা রাখতে হবে না, বলো? সময় ধরার জন্য আর কী করতে পারতাম, বলো।

প্রশ্ন : *যেমন ধরেন, ওই সময়ের পথঘাট। আমরা অনেক যাত্রার বিবরণ পেয়েছি যে সৈন্যদল যাচ্ছে।*

হুমায়ূন : পথঘাট ছিল না, ফর ইয়োর ইনফরমেশন। পথঘাট শুরু করলেন শের শাহ। গ্র্যান্ডটাংক রোড বানালেন উনি। পথঘাট ছিল না তো, যে পথের বর্ণনা দেব। পালকি-টালকি ছিল...আরেকটা কারণ হলো, আগে আমি ঐতিহাসিক যেসব উপন্যাস লিখেছি, যেমন—*জোছনা ও জননীর গল্প*, সেই সময়টা আমি নিজ চোখে দেখেছি বা মধ্যাহ্ন কিছুটা হলেও দেখেছি, বাবা-চাচাদের কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু এই উপন্যাসের সময়টা চাক্ষুস দেখেছে, এমন কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ নেই। বই যেগুলো হাতে আছে, এর বাইরে আমরা কিন্তু কিছু জানতে পারছি না। যে বইগুলো আমি পড়েছি, সেখানে প্রায় কোনো ডিটেইলই নেই। গুলবদন বেগমের বইয়ে যেমন—শুধু

AMARBOI.COM

এভাবে লেখা যে আম্মা এটা বললেন বা আব্বা এটা করলেন। অমুক এটা করলেন, তমুক এটা করলেন। শুধু সারমর্মটা আছে। বর্ণনা সেভাবে নেই।

আর একটা সমস্যা হলো, হুমায়ুনের সময়ের কোনো স্থাপত্যকলাও নেই। সবই ধ্বংস হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয়েছে এইটিন ফিফটি সেভেনে। সিপাহি বিদ্রোহের কারণে ইংরেজরা খুবই খেপে গেল, মোগলের কিছুই থাকবে না এখানে, ইনক্লুডিং তাজমহল। সব ডেমোলিশ করতে হবে। তখন এটা রক্ষা করলেন একজন ইংরেজ সাহেব। তাঁর নামটা এই মুহূর্তে আমি ভুলে গেছি। তিনি এগিয়ে এসে বহু কষ্টে এটা রক্ষা করলেন। লালকেল্লা আর তাজমহল। ওরা ঠিক করেছিল, মোগলের কোনো চিহ্নই রাখবে না।

আর শোনো। আমার লেখার ধরন নিয়ে একটা ছোট্ট কথা তোমাদের বলি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঔপন্যাসিক বলতে হবে তলস্তয়কে। আরেকজন দস্তইয়েভস্কি। এঁরা করেন কী, একটা চরিত্রকে বর্ণনা করা শুরু করেন। ধরো, তোমাকে তারা বর্ণনা করছেন। অনেক লাইন কিন্তু খরচ করছেন তোমার পেছনে। তার চোখ এমন ছিল, তার অল্প কিছু গোঁফ ছিল, নাকটা খাড়া ছিল—টোটাল বর্ণনা দিয়ে তোমার চেহারাটা ফুটিয়ে তুলবেন। আমি কিন্তু ওই লাইনে যাই না। সাধারণত আমি চেহারার বর্ণনা দিই না। আমি এই ব্যবস্থাটা করি। ডায়ালগের ভেতর দিয়েই যেন পাঠক চরিত্রগুলোকে কল্পনা করতে পারে। এটার সুবিধাটা দেখো। আমরা *পথের পাঁচালী* উপন্যাসটা যখন পড়ি, তখন প্রত্যেকেই একজন করে দুর্গাকে কল্পনা করি। একটা অপু কল্পনা করি। সত্যজিৎ রায় যখন ছবি বানালেন, তখন সবার কল্পনাটা সীমিত হয়ে গেল। যে কারণে আমি এত কিছু লিখি, আমি কিন্তু হিমু নিয়ে কোনো সিনেমা বা নাটক করিনি। কারণ, সবার কল্পনায় নিজের মতো একটা হিমু আছে। আমি ওইটায় হাত দিতে চাইনি। মিসির আলিও আমি বানাইনি। অন্যরা দু-একজন বানিয়েছে। আমি এর থেকে দূরে থাকছি। শুভ্রও আমি বানাইনি। বানাতে চাচ্ছিও না। যার মনে যা আছে, সেটাই থাকুক।

প্রশ্ন : *এখানে দেখা যায়, বাদশাহ হুমায়ুনের জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল।*

হুমায়ূন : অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। উনি তাঁর ছেলে আকবরের জন্মের পর নিজের হাতে ৪০ না ৪৫ পৃষ্ঠার একটা কোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। আকবরের জন্মতারিখটা ভুল লেখা আছে। কারণ, সত্যিকারের জন্মতারিখ সবাই জেনে ফেললে জাদুটোনা করে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে। আকবরের জন্মের সময় আফতাবচি সেখানে উপস্থিত। আবুল ফজল এটা জানলেন অনেক পরে। আমরা তো নেব জওহর আফতাবচির মতো।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : *আপনার উপন্যাসে হুমায়ুন প্রবলভাবে ভাগ্যবিশ্বাসী একজন মানুষ, গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার ছাড়া তিনি কিছু করেন না, কিন্তু তাঁর আশপাশে এমন কোনো চরিত্র নেই। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী কারও দেখা কিন্তু আমরা পাই না।*

হুমায়ুন : ঠিকই বলেছ। আমার উপন্যাসে এ রকম কোনো চরিত্র নেই। কিন্তু বাদশাহ হুমায়ুনের লোক ছিল, যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারগুলো দেখত বা তিনি নিজেই দেখতেন বেশির ভাগ সময়। বাবর কিন্তু এসবের ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তলোয়ারের ওপর নির্ভর করতেন, রণক্ষেত্রের ওপর বিশ্বাস রাখতেন। হুমায়ুন দুর্বল মনের মানুষ। এ জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর নির্ভর করতেন।

প্রশ্ন : *আপনি যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, তখন এমন অনেক চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয় যাদের আপনি দেখেননি, বইপত্র ছাড়া যাদের কথা জানার উপায় নেই। এ রকম চরিত্রগুলো আপনি কীভাবে ভিজুয়ালাইজ করেন? কোনো পদ্ধতি কি থাকে আপনার?*

হুমায়ুন : এটা আসলে বলা যাচ্ছে না। ব্রেইনের কোন অংশে কীভাবে আসলে প্রসেস হয়, আমি জানি না। তুমি কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে থেকে শিক্ষা নিয়ে ভালো ছুতার হতে পারবে। কিন্তু লেখকের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে ভালো লেখক হতে পারবে—এটা আমি মনে করি না। এর প্রেরণাটা অন্যখান থেকে আসে। এটা রহস্যময়।

প্রশ্ন : *স্যার,* বাদশাহ নামদার-এর সূত্র ধরে এ রকম আরও *ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ইচ্ছা কি আছে আপনার?*

হুমায়ুন : না, এই মুহূর্তে আমি আর ভাবছি না। অনেক সময় নষ্ট হয় আমার। দুনিয়ার বই পড়তে হয়। আর ব্যাপারটা খুব কনফিউজিং। একেকজন ঐতিহাসিক একেক রকম কথা বলে যাচ্ছেন। ভেরি ভেরি কনফিউজিং। এক ধরনের ইতিহাস পড়লে তোমার মনে হবে, আওরঙ্গজেবের মতো নিষ্ঠুর মানুষ পৃথিবীতে নেই। আরেক ধরনের ইতিহাস পড়লে মনে হবে, ও মাই গড, আওরঙ্গজেবের মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে নেই। একটা উদাহরণ দিই। রাজপুতানার এক রাজার দুজন রানি ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে গর্ভবতী হলেন। তখন রাজা মারা গেলেন। এই দুজনের এক রানি খবর পাঠালেন আওরঙ্গজেবের কাছে, 'আপনি যদি আমার সন্তানকে স্বীকৃতি দেন রাজা হিসেবে, তাহলে আমি আমার লোকজন নিয়ে মুসলমান হয়ে যাব।' আওরঙ্গজেব দুই রানির কোনো ছেলেকেই রাজত্ব দিলেন না। যে রাজা মারা গেছেন, তাঁর ছোট ভাইকে রাজত্ব দিলেন। সভাসদরা বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমরা এত বড় একটা সুযোগ পেলাম। আপনি সেটা নিলেন না কেন?'

AMARBOI.COM

আওরঙ্গজেব বললেন, 'আমি রাজ্য শাসন করতে এসেছি। ধর্মপ্রচার করতে আসিনি। নাবালক পুত্রকে বসিয়ে আমার চলবে না।' আওরঙ্গজেব নিজে খুবই ধার্মিক লোক। তিনি বলছেন এই কথা।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৭

'মৃত্যু নিয়ে প্রায়ই ভাবি'

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আলীম আজিজ** ও **ইকবাল হোসাইন চৌধুরী**

চিকিৎসার জন্য নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হওয়ার দুদিন আগে

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী : প্রথম আলোর *ঈদসংখ্যায় আপনার* মেঘের ওপর বাড়ি *উপন্যাসটি পড়েছি। ভালো লেখেছে। আপনার অন্য উপন্যাসের তুলনায় অন্য রকম।*

হুমায়ূন আহমেদ : বইটা আরেকটু বিশদভাবে লেখার দরকার ছিল।

এ ধরনের আরেকটা বই আমি লিখেছিলাম। বইটার নাম *যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ*। এক লোক তাঁর বউকে খুন করে। মৃত বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

মেঘের ওপর বাড়ি বইটা লিখতে গিয়ে প্রধান যে সমস্যা হয়েছে, সেটা ধর্মীয়। মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ নিয়ে যদি আমি এমন কিছু লিখি, যেটা ধর্মের সঙ্গে মেলে না, তাহলে ধর্মবিশ্বাসী লোকজন তো রাগ করবে। তবে এই বিষয় নিয়ে আগেও বই লেখা হয়েছে। আমাদের এখানে প্রথম এই বিষয় নিয়ে যিনি লেখেন, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটার নাম *দেবযান*। এই বইয়ে তিনি মৃত্যুর পরের জগতের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত্যু নিয়ে প্রায়ই ভাবি। মৃত্যুর পরের জগৎ নিয়েও অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছি। সম্ভবত এটা থেকেই *মেঘের উপর বাড়ি* বইটার ভাবনা মাথায় এসে থাকবে।

আলীম আজিজ : *দীর্ঘদিন ধরে আপনি লেখালেখি করছেন, এখন পেছনে তাকালে কী মনে হয়?*

AMARBOI.COM

হুমায়ূন : মনে হয়, কিছু পরিশ্রম করেছি (হাসি)। কিছু অর্জন হয়তো আমার আছে। আমার স্ত্রী শাওন আমাকে বলে, 'আমি খুব সৌভাগ্যবান একটা মেয়ে। কারণ, আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার স্বামী লিখছে। এর চেয়ে পবিত্র দৃশ্য আর কী হতে পারে!' এই কথাটা আমাকে ভীষণ আনন্দিত করে। আমি ভালো বোধ করি। এটাই লেখকজীবনের বড় পাওয়া মনে হয়।

আলীম : *অতীতের অনেক তুমুল জনপ্রিয় লেখক কালের গর্ভে হারিয়ে গেছেন।*

হুমায়ূন : আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। লেখক হিসেবে আমার আজ প্রায় ৪০ বছর হয়ে গেল। অথবা আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, এত দিনে আসলে আর কোনো লেখক তৈরি হয়নি।

আমি নিজেকে মনে করি নতুন লেখকদের জন্য একটা বিভীষিকা। কথাটা বুঝিয়ে বলি। বিভীষিকা এই অর্থে যে, পাঠক বই কেনে লাইব্রেরি থেকে। বইয়ের বিক্রেতারা যেসব বই বিক্রি হবে, সেগুলো সাজিয়ে রাখে। যেগুলো বিক্রি হয় না, সেগুলো রাখে না। তারা তো সাহিত্যসেবা করতে আসেনি। তারা চায় বই বিক্রি করতে। আমার নতুন বই বের হবে, আমি জায়গা দখল করব। দখলকৃত জায়গার পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। অন্যদের বই প্রদর্শন করারই সুযোগ নেই। এই অর্থে আমি একটা বিভীষিকা।

আরেকটা ভুল কথা আমার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। আমি নাকি বইয়ের পাঠক বাড়িয়েছি। আমি কিন্তু পাঠক বাড়াইনি। পাঠক বাড়ালে তো সবার বই-ই বেশি বেশি বিক্রি হতো। আমি শুধু আমার নিজের পাঠক বাড়িয়েছি। পাঠক যদি বাড়াতাম, তাহলে তো সব বইয়ের বিক্রি বাড়ত।

পড়ার ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত একটা বিষয়। যে বইটা তুমি পড়তে চাও না, সেটা তোমাকে বিনা পয়সায় উপহার দিয়ে সঙ্গে ২০০ টাকা দেওয়া হলেও তুমি বইটা পড়বে না। জোর করে আর যা-ই হোক, কখনো বই পড়া হয় না।

আলীম : *কলম্বিয়ার বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস একটা বয়সে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন লেখালেখি ছেড়ে দেওয়ার। আপনার কি সে রকম কিছু মনে হয়েছে?*

হুমায়ূন : আমারও প্রায়ই মনে হয়, একটা ঘোষণা দিয়ে লেখালেখি ছেড়ে দিই। ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করি। কিন্তু এটা হবে একটা লোক দেখানো ব্যাপার। কারণ, আমি জানি, লেখালেখি ছাড়া বেঁচে থাকাটা আমার জন্য অসম্ভব। এই যে শরীরটরীর খারাপ, তাও কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। যেহেতু লেখালেখি ছাড়া থাকতে পারব না, আলতু-ফালতু ঘোষণা দিয়ে তো লাভ নাই। সাধারণত, আমি যে কথা বলি, সেটা রাখার চেষ্টা করি। যেমন, আমি বলতে চাই, *ঘেটুপুত্র কমলা* আমার পরিচালিত শেষ ছায়াছবি।

AMARBOI.COM

ইকবাল : *ছবিটির কাজ কি শেষ?*

হুমায়ূন : ছবির সব কাজ শেষ। শুধু প্রিন্টটা করা হয়নি। প্রিন্ট হচ্ছে ব্যাংককে। প্রিন্টিংয়ে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। টাকার অঙ্কটা মোটামুটি আঁতকে ওঠার মতো।

ইকবাল : *আপনার সাম্প্রতিক কিছু লেখা পড়ে মনে হয়েছে, অমরত্ব বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে। ২০৪৫ সালের মধ্যে অমরত্ব প্রাপ্তির উপায় আবিষ্কৃত হবে—আপনি লিখেছেন।*

হুমায়ূন : এটা আমার কথা না। এটা বিজ্ঞানীদের কথা। আমিও বিশ্বাস করি। আমরা ক্রমশ সিঙ্গুলারিটির দিকে যাচ্ছি। কলম দাও, বুঝিয়ে বলি।

এই দেখো। ধরো, এই রেখাটা হচ্ছে টাইম। আর এই দিকে আছে বড় আবিষ্কার। সব ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বাড়ছে। আমরা এখন কাছাকাছি চলে এসেছি। ২০২১ সাল নাগাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিস্ফোরণ হবে। এই বিস্ফোরণটাই হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি।

ইকবাল : *অমরত্ব যদি আমাদের নাগালে চলে আসে, ব্যাপারটা কেমন হবে?*

হুমায়ূন : *ইরিনা* নামে একটা উপন্যাস আমি লিখেছি। সেখানে সবাই অমর। যেহেতু মানুষ অমর, তাই মানুষের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। আরও অনেক কিছু ঘটবে। এটার বড় ধরনের একটা সাইড এফেক্ট অবশ্যই থাকবে।

ইকবাল : *অথবা এমন কি হতে পারে যে মানুষ একসময় সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল? যেহেতু তার আর মৃত্যুঝুঁকি, অনিশ্চয়তা—এসব কিছুই থাকছে না।*

হুমায়ূন : এ রকম কিছুও হতে পারে। পুরো বিষয়টাই আসলে খুব বিচিত্র। আজকেই পত্রিকায় পড়লাম। আমরা আসলে বর্তমানের চেয়ে সব সময় ৪০ মিলিসেকেন্ড পেছনে আছি। ৪০ মিলিসেকেন্ড লাগছে শরীরের সমস্ত বিষয়টা প্রসেস করতে। সব মিলিয়ে এত অদ্ভুত! আরেকটা কথা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। স্টিফেন হকিং বলছেন, বাইরের জগতের উন্নত প্রাণীর বিষয়ে চিন্তা না করাটাই ভালো। তারা যেন এখানে না আসে। আমরা চিন্তা করছি, তারা এখানে এলে ভালো হয়। আসলে সেটা হবে না। ওরা তো অভাবনীয় উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে আসবে। আমরা উন্নত প্রাণী। গরু-ছাগল আমরা কেটে খাই, আমাদের প্রয়োজনে। অন্য বিশ্ব থেকে যারা আসবে, তাদের কাছে আমরা হব গরু-ছাগল। তখন সংঘাত অনিবার্য।

ইকবাল : *আপনি কি মনে করেন, অন্য গ্রহে উন্নত প্রাণী আছে?*

হুমায়ূন : অবশ্যই আছে। না থাকার কোনো কারণ নেই। এখন পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে না কেন, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।

ইকবাল : *SETI (সার্চ ফর এক্সট্রা-টেরিস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স) নামের একটা*

AMARBOI.COM

সংগঠন আছে। ওরা ভিনগ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে। ওরা কিন্তু এখনো সে রকম কিছু পায়নি।

হুমায়ূন : আমি জানি। কিন্তু ভিনগ্রহের প্রাণীদের যদি অন্য কোনো সিস্টেম থাকে, তাহলে তো আমরা ওদের ধরতে পারব না। ওদের কার্বন-বেসড লাইফ কেন হবে? ওদের সিলিকন-বেসড লাইফ হতে পারে। ওদের যদি ঠিক চোখ-কান না, অন্য কোনো সিস্টেম থাকে? তাহলে তো আমরা ওদের ধরতে পারব না।

ইকবাল : ঘেটুপুত্র কমলা *ছবির বিষয়টা একটু ভিন্ন ধাঁচের। এই নামে একটি গল্প আপনি লিখেছিলেন। ছবিটি কি কোনো বিতর্ক তৈরি করতে পারে?*

হুমায়ূন : মূলত, গল্পটা থেকেই এই ছবি। এখন তো এই কালচার নেই। গল্পে বিষয়টা আন্ডার কারেন্ট ছিল। ছবিতেও তা-ই। ছেলেটাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছে, ওই পর্যন্তই। তবে পুরো বিষয়টা পরিষ্কারভাবে উঠে আসবে। আমার শুধু একটা অনুরোধ, বাচ্চারা যেন এই ছবিটা না দেখে। আমার ছেলে আমাকে প্রশ্ন করেছে, ঘেটুপুত্র ছেলে, না মেয়ে? আমি চাইছি না বাচ্চারা এই ছবিটা দেখুক। ছবিটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

ইকবাল : *কোনো ঘেটুপুত্রের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। ২০-২৫ বছর আগে তো হবেই। গল্পটা লিখেছি তারও পরে। জিনিসটা মাথায় ছিল। ঘেটুগান ছিল মূলত হাওরভিত্তিক। ওখানকার লোকদের তিন মাস কিছুই করার থাকে না। কর্ম ছাড়া একদল লোক কীভাবে বাঁচবে। তারা গানবাজনা করে। গানগুলোর সুর ক্ল্যাসিক্যাল। একদম ক্ল্যাসিক্যাল সুর। দাঁড়াও, তোমাদের শোনাই।

(কম্পিউটারে পর্দায় ঘেটুপুত্র কমলার গান—'পাখি উড়ি লো...উড়ি লো'।)

ইকবাল : *আমি দেশের অনেক নামি জাদুশিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা আপনাকে দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন পামিং (হাত সাফাই) শিল্পী হিসেবে স্বীকার করেছেন।*

হুমায়ূন : পামিং। এটা শেখার জন্য বছরের পর বছর সাধনা করতে হয়। এখন আর কেউ সেটা করতে চায় না। আমার শুরুই হয়েছে পামিং দিয়ে। বছরের পর বছর আমি এর পেছনে সময় দিয়েছি। হাতের তালুতে পয়সা লুকানোর চেষ্টা করেছি।

ইকবাল : *আপনার প্রিয় জাদুশিল্পী কে?*

হুমায়ূন : অবশ্যই জুয়েল আইচ। ম্যাজিকের প্রতি তাঁর যে আগ্রহ, ডেডিকেশন, সেটার কোনো তুলনা হয় না। আচ্ছা, বলে রাখি, আমার জাপানি ভাষায় একটা বই প্রকাশিত হচ্ছে।

AMARBOI.COM

ইকবাল : *এর আগে জাপানি টেলিভিশনে আপনার ওপর একটা তথ্যচিত্র প্রচারিত হয়েছে।*

হুমায়ূন : হ্যাঁ। সেটা বহুদিন আগে। এই বইটার নাম *বনের রাজা*। বাচ্চাদের বই। আমাদের এখানে অলংকরণ করেছিল ধ্রুব এষ। যেসব প্রাণীর কথা বলা হয়েছে, ওরা সেগুলো তৈরি করেছে। তারপর সেগুলোর ছবি তুলেছে। খুব যত্ন নিয়ে করেছে বইটা।

ইকবাল : *হিমু প্রসঙ্গে আসি। হিমুর এবারের বইয়ে দেখা যাচ্ছে, মাজারের হুজুরের কাছে হার্ভার্ড পিএইচডি বল্টু ভাই, মানে একজন বড় বিজ্ঞানী, গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। মাজারে আসার পর তাঁর মাথার জট খুলে যাচ্ছে। আপনার অবচেতন মনে, এটা ছিল যে বিজ্ঞান সবকিছুর উত্তর দিতে পারে না?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, পারে না। বল্টু ভাইয়ের মতো বই পড়েই আমরা সবকিছু জানতে পারব না। যেমন, ওই হুজুর বলেছেন, যে চিনি খায়নি সে কি বই পড়ে বুঝতে পারবে চিনির কী স্বাদ?

ইকবাল : *আপনার লেখার মধ্যে এমনিতে মোটা দাগে কোনো ফর্মুলা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু অনেক সময় আপনাকে পাঠক ধরে রাখার কিছু সহজ কৌশল অবলম্বন করতে দেখি। ধরা যাক, সাধারণ একটা লোকজ ধাঁধা আপনি বইয়ের শুরুতে ব্যবহার করছেন। যার উত্তর মেলে বইয়ের শেষের দিকে। এটা কি সচেতনভাবে করেন?*

হুমায়ূন : এটা আসলে পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য করি। একটা পৃষ্ঠা পড়ার পর পাঠক যাতে পরের পৃষ্ঠাটা পড়ে। কৌশলটা যে খুব ভালো, তা বলব না। তলস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস*-এ প্রথম দেড় শ পৃষ্ঠা আমার কাছে খুবই একঘেয়ে মনে হয়েছে। পাতার পর পাতা শুধুই একটা পার্টির বর্ণনা। কিন্তু যখন তুমি গল্পটার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছ, তখন তুমি বারুদের গন্ধ পাবে। যুদ্ধটাকে অনুভব করতে পারবে। আমি প্রথম পৃষ্ঠায় আটকে ফেলতে পেরেছি, তার মানে আমি বিরাট লেখক, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। জাপানি লেখক হারুকি মুরাকামির একটা বই পড়ছি। পড়ে মুগ্ধ হলাম। তার গল্প বলার ধরন অসাধারণ। খুব সহজ কথা বলছে, কিন্তু একই সঙ্গে এত গভীর কথা বলে যাচ্ছে।

আলীম : *আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?*

হুমায়ূন : ঈশ্বরবিশ্বাস আমার আছে। ধরা যাক, তুমি একটা গ্রহে গেছ। গ্রহটা দেখে তোমার মনে হতে পারে, চিরকাল ধরে গ্রহটা একই রকম আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি যদি একটা নাইকন ক্যামেরা দেখ, তোমাকে সেটা হাতে নিয়ে বলতেই হবে, এটার একজন কারিগর বা মেকার আছে।

AMARBOI.COM

সামান্য একটা প্লাস্টিকের ক্যামেরা দেখে তুমি বলছ, এর একটা মেকার আছে। ক্যামেরার কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তোমার পেছনে একটা মানুষ আছে। ক্যামেরায় পেছনের মানুষটাকে ফোকাস করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি হয়ে যাবে আউট অব ফোকাস। আবার তোমাকে ফোকাস করার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের জন হবে আউট অব ফোকাস।

মানুষের চোখের কিন্তু এই অসুবিধে নেই। চোখ ক্যামেরার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। আমাদের শরীরে একটা যন্ত্র আছে, যার কাজ শরীরের সুগার-লেভেল ঠিক রাখা। মানুষের পুরো শরীর এমন বিচিত্র আর জটিল যন্ত্রপাতিতে ভরপুর। এসব জটিল ব্যাপার এক দিনে এমনি এমনি হয়ে গেছে, এটা আমার মনে হয় না। 'ডারউইন থিওরি' কী বলে? বলে, সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। বলে, পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে মানুষের সামনে নানা রকম বিপত্তি আসবে, সেগুলো জয় করতে গিয়ে আমরা এ রকম হয়ে গেছি। পশুর চোখ কিন্তু হলুদ। আর আমাদের চোখ সাদা। এটা হয়েছে, যাতে মানুষ অন্ধকারের মধ্যে নিজেরা নিজেদের চিনতে পারে। আমাদের টিকে থাকার জন্য এইটুকু জ্ঞানই তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মানুষের মাথায় এই জ্ঞান কীভাবে এল যে সে রীতিমতো 'বিগ ব্যাং থিওরি' আবিষ্কার করে ফেলল? এই এক্সট্রা-অর্ডিনারি জ্ঞানটা মানুষকে কে দিল? খেয়াল করলে দেখা যাবে, মানুষ সবার আগে যে বাড়িটা বানায়, সেটা একটা প্রার্থনাকক্ষ। সব জাতির মানুষের ক্ষেত্রেই তা-ই। তার মানে, সেই একদম শুরু থেকেই মানুষ আসলে একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত—হু ইজ গাইডিং মি?

ইকবাল : *মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ নিয়ে আপনার নিজের চিন্তাভাবনা কী?*

হুমায়ূন : এই বিষয়ে আমার প্রবল একটা আগ্রহ সব সময় ছিল। একবার আমি চেষ্টা করলাম প্রার্থনা করব। প্রতিদিন একটা সময়ে বসি। পৃথিবী থেকে বিদায়মুহূর্তটা কেমন হবে, এটা জানা যায় কি না চেষ্টা করি। দিনের পর দিন এটা চলল। তখন আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন আমাকে দেখানো হলো। অথবা আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, দিনের পর দিন একটা ব্যাপার চিন্তা করার ফলে আমার মস্তিষ্ক সেটা তৈরি করল। অনেক বড় বিজ্ঞানীর বেলায়ও এটা হয়েছে।

আমি কী স্বপ্নে দেখেছি সেটা বলি—বিশাল একটা হাওর। হাওরের মধ্যে পানি, পানি আর পানি। কলাগাছের মতো একটা জিনিস ধরে আমি ভাসছি। পানি অল্প ঠান্ডা। কলাগাছের মতো জিনিসটা মনে হচ্ছে একটা যান। সেটা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে মনে হলো—মাই গড! এ তো আনন্দের পৃথিবী ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি! সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা বন্ধ হলো। আবার ফিরে এলাম। আমার এই বাড়িঘর—সব আগের মতো। আমি দেখলাম। তখন আমার মনে হলো—আর

কী? এবার যাই। আমার যাত্রা আবার শুরু হলো। অনেক দূর গিয়ে আবার মনে হলো—ও মাই গড! সব ফেলে আমি কোথায় যাচ্ছি! আবার ফিরে এলাম। তারপর আবার মনে হলো—এই তো সব। আর কী? এরপর যানটা একটা অকল্পনীয় গতিতে ছুটতে শুরু করল। কোন দিকে যাচ্ছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। দূরে ছোট্ট একটা আলো।

এটাই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা। হতে পারে, আমার মস্তিষ্ক এটা তৈরি করেছে। আবার না-ও হতে পারে।

ইকবাল : মেঘের ওপর বাড়ি *বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে আমরা দেখি, নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য একজন।*

হুমায়ূন : আমরা তো সাধারণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ কী বলে গেছেন? বলে গেছেন, আমি তো লিখি না, জীবনদেবতা আমাকে দিয়ে লেখান। আবার, এমনও হতে পারে, আমরা খুব অসহায় বোধ করি বলেই একজন বড় পথনির্দেশকের কথা চিন্তা করি।

ইকবাল : *আপনি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। দেশটা আপনার কেমন লাগে?*

হুমায়ূন : ওখানে যাওয়াটা আমার জন্য ভয়ের ব্যাপার। দীর্ঘ বিমান ভ্রমণ খুবই ক্লান্তিকর। আর বিমান ভ্রমণ আমার জন্য এমনিতেই আতঙ্কজনক। কারণ আমার উচ্চতাভীতি আছে। সারাক্ষণ মনে হতে থাকে—এই বুঝি সব ভেঙেচুরে নিচে পড়ে যাব।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১

AMARBOI.COM

৮

কিছু অলৌকিক ঘটনার বয়ান

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আলীম আজিজ** ও **তৈমুর রেজা**

প্রশ্ন : *আপনার উপন্যাস* বাদশা নামদার *-এ পরাজিতের লেখা কোনো ইতিহাস উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়নি?*

হুমায়ূন : হবে কী করে? ইতিহাস কে লেখে জানো? যারা জয়লাভ করে, ইতিহাস

সব সময় তারাই লিখে। বিজয়ের ইতিহাস লেখে। পরাজিতরা কখনো ইতিহাস লিখতে পারে না। পরাজিতরা কখনো ইতিহাস লেখার সুযোগ পায় নাই। এ সময়েই দেখো না, হিটলারের পক্ষে কোনো ইতিহাস লিখতে পেরেছে কেউ?

প্রশ্ন : *বাংলা অঞ্চলের কোনো বীরকে নিয়ে কি আপনার কিছু লেখার ইচ্ছে আছে? উদাহরণ হিসেবে তিতুমীরের কথা বলা যায়। এঁদের নিয়ে তো কোনো লেখা হয়নি বললেই চলে।*

হুমায়ূন : আমাদের কিশোরগঞ্জেই তো আছে। বীরাঙ্গনা সখিনা। 'আউলায়ে খুলল কন্যা পিন্ধনের বেশ।' আমার লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এগুলো খুবই আঞ্চলিক। বীরাঙ্গনা সখিনা, তিতুমীর বা ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ।

প্রশ্ন : *লাতিন আমেরিকার মতো ভাবা যায়? লাতিন আমেরিকার লেখকেরা একটা চরিত্র খাড়া করে প্রতীকী উপস্থাপনের দিকে চলে যান। মানে, সরাসরি কথাটা না বলে, রূপকের মধ্য দিয়ে বলা। যেমন, মার্কেস লিখেছেন* অটাম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক। *মানে, ওই সময়টাকে ঠিকই ধরেছেন উনি। কিন্তু চরিত্রগুলো তাঁর মতো করে বদলে নিচ্ছেন। আপনার হাত দিয়ে এ ধরনের একটা কাজ কি হতে পারত না?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, নানাভাবেই ভাবা যায়। কিন্তু এতে যথার্থতার একটা সমস্যা থেকে যায়। যিনি যখনই কিছু বলছেন বা লিখছেন, তাঁর রাজনৈতিক পছন্দের বাইরে সাধারণত যেতে পারেন না। মার্কেসও পারেননি।

প্রশ্ন : *আপনার রাজনীতির ব্যাপারে অনাগ্রহ, রাজনৈতিক লেখালেখিতে খুব সরব না, এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?*

হুমায়ূন : আসলে, আমার দেখা প্রথম মানুষ তো আমার বাবা। উনি *ইত্তেফাক*-এর নাম দিছিলেন মিথ্যা-ফাক।

প্রশ্ন : *আপনার ওপর বাবার যতটা প্রভাব, মুহম্মদ জাফর ইকবালের ওপর কিন্তু প্রভাব ততটা না।*

হুমায়ূন : সে তো বাবাকে কম দিন দেখেছে, এটা একটা কারণ হতে পারে। তবে আমার কাছে মানবিক সম্পর্ক রাজনীতির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। যেমন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নারী-পুরুষের ভালোবাসার কথা বলুন। বলুন প্রেম কী? সংজ্ঞা দিন। আচ্ছা, প্রেম সম্পর্কে তোমাদের সংজ্ঞা কী এই সময়ে? এখনকার তরুণ-তরুণীরা কী ভাবে?

প্রশ্ন : *সংজ্ঞা আর কী? এটা একধরনের অনুভূতি। মানসিক অবস্থা।*

হুমায়ূন : আমার সংজ্ঞাটা শোনো, প্রেম হচ্ছে 'ভেতরে লুকিয়ে থাকা কিছু একটা'। ধরা যাক, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটা মেয়েটার প্রেমে পড়েছে। মেয়েটা যখন সামনে আসবে, তখন ছেলেটার ভেতরে লুকিয়ে থাকা কিছু একটা

AMARBOI.COM

বের হয়ে আসবে। তখন যেটা হবে, সেটা ইউফোরিয়া। একধরনের আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষাদ, সে কতক্ষণ থাকবে। একটু পরেই তো সে চলে যাবে, তখন কী হবে! তারপর আবার কখন দেখা হবে? এই যে অনিশ্চয়তা, এর মধ্যে কিন্তু দারুণ এক আনন্দ আছে। প্রেমিকার কথা ভাবলে প্রেমিকের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রেমিকা চলে যাবে, সে তো থাকবে না। এই বিষাদ, প্রশ্ন, অনিশ্চয়তা; অর্থাৎ 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।' যখন চলে গেল, ইউফোরিয়া শেষ। গভীর হতাশায় তুমি নিমজ্জিত। আবার যখন আসবে, লুকিয়ে থাকা জিনিসটা তখন আবার বেরিয়ে আসবে। এখন বলো, প্রেমের রসায়ন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

প্রশ্ন : *শারীরিক কিছু?*

হুমায়ূন : এটাকে আরেকটু সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা যায়। তুমি কি একটা কুরূপা, দেখতে ভালো না, অসুন্দর, খাটো মেয়ের প্রেমে পড়বে? উল্টোভাবেও ভাবা যায়, কুদর্শন পুরুষের প্রেমে কি একটি সুন্দরী মেয়ে পড়বে? আসলে অত্যন্ত রূপবতী কাউকে দেখলেই প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা তোমার বেশি। এর অর্থ হলো, প্রকৃতি চাচ্ছে, তার সন্তান-সন্ততি যেন সুন্দর হয়। এটা প্রকৃতির চাহিদা। প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য এমন একটি প্রজাতি তৈরি করা, যেটি হবে অসম্ভব রূপবান, যেটি হবে অসম্ভব জ্ঞানী ও বুদ্ধিসম্পন্ন, যেটি হবে বিত্তবান। প্রকৃতি মনে করে, এই বিশ্বকে বাসযোগ্য রাখার জন্য, সচল রাখার জন্য এটা জরুরি। নিরন্তর প্রকৃতি তার এই প্রক্রিয়া সচল রেখে চলেছে।

প্রশ্ন : *কিন্তু অসুন্দর নারী-পুরুষের জীবনও তো একেবারে প্রেমহীন বলা যাবে না। তাদের প্রেমেও তো কেউ না কেউ পড়ে?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, সেটা ঘটে। যৌবনে কুদর্শনও একভাবে আকর্ষণীয়। প্রকৃতি তার কথাও যে ভাববে না, এমন না। প্রকৃতি সেটাও ভাবে। অনেক সময় অনেক সুন্দরী মেয়েও অসুন্দর পুরুষের প্রেমে পড়ে। এতেও ভারসাম্য রক্ষা হয়। ওই জুটির ঘরেও সুদর্শন সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু নয়। এভাবেও প্রকৃতি কাজ করে। চারপাশে তাকালে এটা বুঝতেও পারবে। এবং এটার মূলেও আছে কিন্তু ওই একই জিনিস। এটাও প্রেমের রসায়ন। এগুলো আমার কথা না, সিরিয়াস গবেষণা করে এগুলো বের করা হয়েছে। এ রহস্য এক দিনে উদ্ধার হয়নি।

প্রশ্ন : *প্রেমের মতো স্রষ্টা নিয়েও আপনার ভাবনা আছে?*

হুমায়ূন : আমি মনে করি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। আমি স্টিফেন হকিংয়ের একটা লেখা পড়লাম। প্রকৃতির মধ্যে কিছু নিদর্শন তো আছেই। তোমাকে একটা যুক্তি

AMARBOI.COM

দিই, শোনো। এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় যুক্তি। তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়েছ। সেখানে গিয়ে তুমি দেখলে পাহাড়, পর্বত, পাথর। পাথর দেখে তুমি বলবে, বহুকাল থেকে, সেই আদ্যিকাল থেকে পাথরগুলো এভাবেই আছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তুমি দেখতে পেলে একটা নাইকন ক্যামেরা। তুমি সেটা হাতে নেবে। তখন তোমাকে বলতেই হবে, এর একজন স্রষ্টা আছে। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে তুমি এ কথা ভাবতে পারবে না যে শূন্য থেকে এটা আপনা-আপনি এসে হাজির হয়েছে। কারণ, এটা একটা জটিল যন্ত্র। এবার, আরেকটু এগিয়ে গেলে। কোত্থেকে একটা খরগোশ বেরিয়ে এসে তোমার দিকে তাকাল। নাইকন ক্যামেরা কী করে? ছবি তোলে। খরগোশ কী করে? অনেক কাজই করে। খরগোশের একটা কাজ হলো দেখা। এই খরগোশের চোখ নাইকন ক্যামেরার চেয়ে হাজার গুণ বেশি জটিল। নাইকন ক্যামেরাটা দেখে তোমার যদি মনে হয় যে এর একটা নির্মাতা থাকা দরকার, তাহলে খরগোশের বেলায় এটা তোমার মনে হবে না কেন? আমার প্রথম যুক্তি যদি গ্রহণ করো, আমার দ্বিতীয় যুক্তিটাও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল এ রকম। অণু-পরমাণুতে ধাক্কাধাক্কির ফলে একটা জটিল অণুর জন্ম হয়েছে। একসময় এটা এত দূর জটিল হয়ে উঠছে, সেটা একেবারে নিজের মতো আরেকটা জিনিস তৈরি করতে শুরু করেছে। তারপর তৈরি হলো মানুষ। অসম্ভব ধীমান একটি প্রাণী। একটা গোলাপ ফুল দেখে যে মানুষ তারিফ করতে পারে, একটা পরম শৃঙ্খলা ছাড়া শুধু ধাক্কাধাক্কি করে কি এটা সম্ভব হতে পারে? এবং এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে অণু-পরমাণুর ধাক্কাধাক্কির ফলে আমরা গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি? এই পৃথিবীর সবকিছু পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনে চলে। প্রোটন হবে ইলেকট্রনের চেয়ে ১ হাজার ৮৩৬ গুণ বড়। সমস্ত তত্ত্ব, সংখ্যা ধ্রুব। এই ধ্রুবত্ব কে নির্ধারণ করেছে?

বিজ্ঞান কোনো বিষয় সম্পর্কে হুট করেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। তার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই পদ্ধতি তো শুরু থেকে ছিল না। যেমন—অ্যারিস্টটল বলছিলেন, মানুষের মস্তিষ্কের কাজ হলো শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা। কথাটা অ্যারিস্টটল বলেছিলেন বলেই আমরা এক হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। এখন বিজ্ঞান অনেক অদ্ভুত কথা বলছে। যেমন—মানুষের শরীরের মধ্যে যে ডিএনএ থাকে, তার মৃত্যু নেই।

তাই আমি মনে করি, আমরা এখনো খুব অল্প বিষয়ই জানতে পেরেছি। একজন পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে রসায়ন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভব না। জ্ঞানের পরিধি অনেক অনেক বড়। যুগে যুগে যেসব ধর্মপ্রচারক এসেছেন—তাঁরা কিন্তু একটা সামগ্রিক ধারণা রাখতেন জগৎ বিষয়ে। আল্লাহ তাঁদের কাছে সব সময়

AMARBOI.COM

সরাসরি জ্ঞান দেন নাই। তাঁরা সব সময় যে সরাসরি ওহি পেয়েছেন, তা তো না? জিবরাইল কি সব সময় সশরীরে এসে ওহি পৌঁছে দিয়েছেন? না। অনেক সময় শব্দের মাধ্যমে, অনেক সময় আলোর মাধ্যমেও ওহি পাঠানোর ব্যাপারটা ঘটেছে। এ কারণে আমার মনে হয়, মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সৃষ্টিকর্তাকে পুরোপুরি কখনো জানা সম্ভব না।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের মতো, এটা ধরে নিয়ে কিন্তু আমি চিন্তা করছি না। আমি চিন্তা করছি এমন একটা অস্তিত্ব নিয়ে, যে সর্বব্যাপী। তাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনাশক্তি দিয়ে কল্পনা করতে পারছি না। তিনি আমাদের কল্পনাসীমার বাইরে। অনেক সূরায় নানাভাবে এসেছে এ প্রসঙ্গ। সূরা এখলাসও এ বিষয়েই।

কিন্তু আমি সৃষ্টিকর্তাকে জানতে চাই। আমার নিজের জীবনে নানা ঘটনা বিভিন্ন সময়ে আমাকে ভাবিয়েছে।

প্রশ্ন : *সেটা কেমন?*

হুমায়ূন : নুহাশ পল্লীতে একটা অংশ আছে যেখানে প্রচুর গাছপালা। ওদিকটায় কেউ যায় না, যেহেতু গাছগাছালি ছাড়া কিছু নাই। একবার এক দুপুরবেলা একা একা আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুই ভালো লাগছে না। এ সময় আমার প্রস্রাবের বেগ পেয়ে গেল। এখন ওখান থেকে হেঁটে ফিরে গিয়ে পেশাব করব? এখানে যেহেতু সুবিধাটা আছে...গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পেশাব করছি। অর্ধেকের মতো পেশাব করা হয়েছে, পেশাবের মাঝখানে খুব মিষ্টি একটা গলা, মেয়েদের গলা : এখানে এই কাজ করছেন? আমরা এখানে বেড়াই! আমার যা মনে হলো, যেহেতু মেয়ের গলা, আর পেশাবের মাঝখানে ঘুরে দাঁড়াতেও পারছি না। মনে হলো, প্রায়ই তো নুহাশ পল্লীতে লোকজন ঘুরতে আসে—এদেরই কেউ হয়তো। তড়িঘড়ি পেশাব শেষ করে ঘুরে তাকালাম, দেখি কেউ নেই। কেউ না। আমি দৌড়ে বার হয়ে এসে খুঁজলাম, দেখলাম কোথাও কেউ নেই। তারপর আমি ম্যানেজারকে ডাকলাম : অর্ডার দিয়ে দিলাম এখানে কেউ যেন বাথরুম না করে। এবং দ্রুত কাছেই একটা টয়লেট তৈরির করার ব্যবস্থা করতে বলে দিলাম।

প্রশ্ন : *এখন এই ঘটনাটার কী ব্যাখ্যা?*

হুমায়ূন : না, এভাবে না। এর প্রথম ব্যাখ্যা হলো; ওটা ওই কোনো একটা এনটিটি, যাদের আমরা চোখে দেখি না। ওদের কেউ। এটা একটা ইজি ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা বলি : আমার সাবকনসাস লেবেল এই কাজটা পছন্দ করে নাই। সাবকনসাস লেবেল হয়তো চায় নাই আমি এই কাজটা করি, তাই নিজে নিজে একটা এনটিটি তৈরি করে তাকে দিয়ে আমাকে বলিয়েছে। শেষটাই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : *এ রকম ঘটনার মুখোমুখি আপনি আরও হয়েছেন?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, অনেকবার। আরও একটা ঘটনা শোনো। তখন আমি মুহসীন হলে থাকি। আমার বড় মামা, তাঁর পড়াশোনা হলো মেট্রিক। নানা দেখলেন তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাচ্ছে না, তখন উনাকে একটা ফার্মেসি করে দিলেন। গ্রামে যারা ফার্মেসি চালায় তারা কিন্তু প্রত্যেকেই ডাক্তার হয়ে যায়। কোয়াক। মামা কোয়াক ডাক্তার হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর এমন যশ হলো, ওই হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া আশপাশের এমবিএস ডাক্তারদের কাছে কেউ যায় না। মামা রোগী দেখছেন। এতে কখনো রোগী বাঁচছে, কখনো মারা যাচ্ছে। বেশ পয়সা হচ্ছে। তো আমাদের গ্রামের কাছেই একটা জঙ্গলমতো ছিল। একবার জঙ্গলের কাছ দিয়ে রোগী দেখে বাড়ি ফিরছেন মামা। বর্ষাকাল যেতে যেতে মামা এক সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে ফেলল সাপ। ভয়ংকর সাপ। মামা শুধু বলার সুযোগ পেল, আল্লাহ আমাকে বাঁচাও আমি বাকি জীবন তোমার সেবা করব। সাপ ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে নিল। মামা পা তুলল, সাপটা চলে গেল। ফিরে আসার পর, তাঁর ডাক্তারি বিদ্যা শেষ, মামা সারা দিন শুধু আল্লাহকে ডাকেন। আমি বড় মামাকে বললাম, বড় মামা এই যে শুধু আল্লাহকে ডাকেন—এভাবে ডেকে কিছু কি পাইছেন? জবাবে মামা বললেন পাইছি। জিজ্ঞেস করলাম কী পাইছেন? আমি আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে একটা পর্যায়ে নিজেকে দেখতে পাই। দেখি, আমি নিজের সামনে বসে আছি। আমি হেসে বললাম, এটা এমন আর কি! আয়না ধরলেই তো আমরা নিজেকে দেখতে পাই। মামা বললেন, এটা সে দেখা না—আমি দেখতে পাই আমি আমার সামনে বসে জিকির করছি। তখন আমার ইচ্ছে হলো এই লাইনে একটু ভেবে দেখা যায়।

প্রশ্ন : *মানে আপনিও মামার মতো শুরু করলেন?*

হুমায়ূন : হ্যাঁ, মামাকে বললাম। মামা বলল, আল্লাহর একটা ডাকনাম তোমাকে শিখিয়ে দিই। এইটাই তুমি সব সময় জপ করবে, শুরুতে অল্প অল্প পারবে পরে দেখবে অভ্যস্ত হয়ে গেছো। কী নাম, নাম আল্লাহু, খুবই সরল। ঢাকায় ফিরে আসলাম। মুহসীন হলে থাকি। শুরুতে কখনো হয় আবার হয় না, প্রায়ই ভুলে থাকি। কিন্তু হঠাৎ করে যদি কোনো মাওলানা দেখি, কোনো দাড়ি-টুপির সৌম্য চেহারার লোক দেখি, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আল্লাহু করতে থাকি। এই শুরু হলো। এরপর অভ্যাস হয়ে গেল, তারপর দেখি সারাক্ষণ করছি। এটা কেমন হলো! চাইলেও থামাতে পারছি না। পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়তে যাই। পাবলিক লাইব্রেরিতে তখন খুব ভালো ভালো গল্পের বই ছিল। একদিন বই নিয়ে পড়ছি, পাশের টেবিল থেকে একজন এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, কী, আপনার সমস্যা

AMARBOI.COM

কী? আমি যে সারাক্ষণই আল্লাহু আল্লাহু করছি, এটা আমি নিজেই আর বুঝতে পারছিলাম না। এটা যে সাউন্ড হিসেবে বাইরে চলে আসছে বুঝতে পারিনি। ক্লাসে গিয়ে এই ভয়ে একেবারে দূরে গিয়ে, একলা বসি। যাতে কেউ শুনতে না পায়। একদিন শিক্ষক এসে বললেন, কী ব্যাপার, তুমি একলা পেছনে বসে আছো কেন? আসো আসো সামনে এসে বসো। তখন আমি কঠিনভাবে চেষ্টা করি, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়। এদিকে রাত্রে স্বপ্ন দেখি একটা বিশাল ঘর, বহু লোকজন বসে আছে এবং প্রত্যেকেই আল্লাহু আল্লাহু করছে। চারদিকে শুধু একটা সাউন্ড হচ্ছে। এক লয়ের সাউন্ড হচ্ছে, চারদিকে। একসময় ঘুম ভেঙে যায়। আমি দেখি, নিজেই আল্লাহু আল্লাহু করছি। বিষয়টা এতই কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়, ভাবি কীভাবে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আমার জীবন শেষ। প্রতি রাত্রেই এই ঘটনা। আল্লাহু আল্লাহু শব্দে ঘুম ভাঙে। দেখি, আমি সিজদার ওপরে। ঘুম ভাঙে আবার ঘুম ধরে। এক রাতে চোখ খুলে দেখি, ঠিক আমার মুখের সামনে এক বিঘত দূরে একটা ফেস। ফেসটা মাথার সামনে চুল নাই, পেছনেও চুল নাই। কঠিন চেহারা, দাঁত নাই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার মনে হলো চোখে চশমা নাই, কী দেখতে কী দেখেছি। চোখে চশমা দেব, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সব সময় চশমা হাতের কাছে রাখতাম। চোখে চশমা পরলাম, দেখি আছে। যেন ভেসে আছে মুখটা।

প্রশ্ন : *শুধু ফেস, না পুরো শরীরধারী?*

হুমায়ূন : বলতে পারব না। অনেকে পরে জিজ্ঞেস করেছে, ওটার শরীর ছিল কি না। আমি মনে করতে পারি নাই। চোখটা আবার বন্ধ করলাম। ভাবছি দিস ইজ এন্ড অফ মাই লাইফ। আই অ্যাম গোয়িং টু ডাই। সমস্ত শরীর দিয়ে পানির মতো ঘাম ঝরছে। তখন কেন যেন মনে হলো, কেউ যদি এই মুহূর্তে, আশপাশের কোথাও থেকে আজান দেয়, তাহলে জিনিসটা চলে যাবে। কিন্তু কে আজান দেবে। একবার মনে হলো আমি আজান দিই। কিন্তু দেখলাম আমি আজান জানি না। তারপর একমনে শুধু বলছি আজান-আজান। আজান। এভাবে বলতে বলতে ইউনিভার্সিটি মসজিদ থেকে আজান শুরু হয়ে গেল। আজান চলল। তারপর চোখ মেললাম, দেখি চলে গেছে। বহু কষ্টে দরজা খুলে পাশের রুমে গেলাম। পাশের রুমমেট মাওলানা মোহাদ্দেস পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। অজু করে এসেছে। আমি তাকে বললাম, ভাই আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। আপনি কি আপনার নামাজটা আমার ঘরে পড়বেন? উনি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন না, বললেন অবশ্যই অবশ্যই হুমায়ূন। উনি নামাজ পড়লেন। আমি আর ক্লাসে গেলাম না। আমার সমস্ত শরীর ফুলে গেছে, সারাক্ষণ হাতের তালু আর পা চুলকাচ্ছে। বাবাকে

AMARBOI.COM

খবর দেওয়া হলো। আব্বা নিজে এসে আমাকে হল থেকে নিয়ে গেলেন। এক মাস থাকলাম বগুড়ায়। এক মাস পর একটু সুস্থ হলে আবার হলে ফিরে এলাম। জীবনযাপন আবার শুরু হলো।

প্রশ্ন : *কেন এমন হলো মামাকে আর জিজ্ঞেস করেননি?*

হুমায়ূন : করেছি। পরে মামার ব্যাখ্যা ছিল আমি ভুল করেছি। এটা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে করতে হতো। রং ওয়ে টু ডু। আমি সিরিয়াসলি নিইনি। মামার কথা ঠিক ছিল। যে কারণে আমি বিষয়টার জন্য আসলে নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত ছিলাম।

প্রশ্ন : *অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!*

হুমায়ূন : অনেক মানুষের ভেতরে কঠিন ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ থাকতে পারে। যে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। আমি যদি দূর থেকে তাকে মনে মনে বলি আসসালামুয়ালাইকুম। তাহলে তার টের পাওয়া উচিত এবং সালামের জবাব দেওয়া উচিত। এটা একধরনের খেলা।

প্রশ্ন : *আরেকটি ঘটনা?*

হুমায়ূন : শোনো, হলো কি? আমি যাকেই দেখি মনে মনে বলি আসসালামুয়ালাইকুম। শীতের রাত শহীদ মিনার চত্বরে চা খেয়ে রওনা দিয়েছি। রোকেয়া হলের সামনে বড় রাস্তাটা ক্রস করতে হবে। আমার সঙ্গে ড. আতিকুর রহমান। এখন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। দুই বন্ধু কথা বলতে বলতে, গল্প করতে করতে রাস্তা পার হচ্ছি। যথারীতি অভ্যাসবশে প্রবীণ লুঙ্গি পরা খালি গায়ে এক লোক যাচ্ছে, অভ্যাসবশে সালাম দিয়ে বসলাম। আমরা রাস্তা ক্রস করে এপারে এসেছি—ওই লোক দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, এই শুনে যা! আমার বন্ধু আতিক খুব রেগে গেল। এত বড় স্পর্ধা! তুই করে বলছে! আমি থামালাম তাকে। লোকটা কাছে এগিয়ে এল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। এবার যা!

আমি তো স্তম্ভিত। ও মাই গড! এ তো সেই লোক, আমি এদ্দিন যাকে খুঁজছিলাম। এমন ভয় পেলাম আতিককে টানতে টানতে আমি হাঁটা দিলাম। দূরে এসে পেছনে ফিরে দেখি ওই লোক তখনো তাকিয়ে আছে। একদৃষ্টে।

২৭ জুলাই ২০১২

AMARBOI.COM